স্বপ্ন পরিব্রাজকদের কথা

স্বপ্ন পরিব্রাজকদের কথা

গৌতম গুহ রায়

চিহ্ন

উজানের টানে...

*চিহ্ন*প্রকাশনা বইধারা–২৬

স্বপ্ন পরিব্রাজকদের কথা [Swapna Paribrajakder Kotha]

গৌতম গুহ রায়

গ্রন্থস্বত্ত্ব
আরাত্রিকা গুহ রায়

চিহ্ন

উজানের টানে...

[Swapna Paribrajaker Kotha a collection of Essays by Goutam Guha Roy]
প্রথম প্রকাশ ॥ ফেব্রুয়ারি ২০১৪ ॥ ১৩০ শহীদুল্লাহ কলাভবন, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় ॥ রাজশাহী–৬২০৫। দাম : ১৫০ টাকা

কবি, জ্বলন্ত ঝিনুক ভাসে শব্দের ঢেউয়ে
জলের গভীরে শব্দ–চাষীর যে নিঃস্ব
করতল

গৌতম গুহ রায়ের অন্য গ্রন্থসমূহ

সাপ স্বপ্ন সহবাস (১৯৮৬)
দাহ্য বৃষ্টির কবিতা (২০০২)
বনফুল ও নিষাদ লিখন (২০০৪)
রেখা তামাঙের ঝর্না (২০০৬)
কুয়াশা উড়ন্ত ঝাপি (২০১১)

ভাষান্তর

র‍্যাঁবো, অনন্ত আত্মার প্রহরী (২০০৭)

প্রবন্ধ

আশা স্বপ্নের ছাইভস্ম (২০০৮)

সংকলন ও সম্পাদনা

ব্যক্তিগত ক্রুশকাঠ (১৯৮৪)
জলপাই স্যাঞ্চুয়ারির কবিতা (২০০৩)
ভাষা : সংবেদন ও সৃজন (২০০৬)
ভাষাচর্চা : তর্ক বিতর্ক(২০১৩)

দুটি কথা

কবি যদি সমঝোতামনস্ক হন তা হলে ক্ষতি কী? কবি যদি বাজারের চাহিদা মতন ‘কবিতার নোটন নোটন পায়রাগুলির লক্কা কবুতর’ উড়িয়ে ধুতি কোঁচা মেরে বসতে চান, আপত্তি কীসের? কবিতা যদি হয় ‘অলীকবাবুদের সাজঘরে টানানো ছদ্মক্লাসিক দর্পণ’ তো আপত্তি কার? কবিতা যদি চিড়িয়া ও চাঁদের মুখে চুমু খাওয়া ল্যাকমেবিবিদের ফ্রুটি বা বিউটিপার্লার হয় তো কী যায় আসে আপনার আমার? কবিতার চাঁদমারি যদি কোনো নক্ষত্রসভার সাফল্যমণ্ডিত দূরতম ছায়াপথের শিরোপা সত্র হয় তো আপনার চুলকানি কেন?...

এমন জিজ্ঞাসাপুঞ্জের সামনে দাঁড়িয়ে বাংলা ভাষার কবিতা পাঠক আপনি, জিজ্ঞাসাপ্রবণ হয়ে উঠুন এবার, অন্তত, তা হলে কয়েকটি আলোকোজ্জ্বল দরজা খুলতে পারে। পাঠককে দাঁড় করিয়ে দেওয়া নয়, কবিতার পাশাপাশি কবির কাছাকাছি তিনি এগিয়ে যান, অন্তত, কয়েক কদম। সাদা কাগজের ও কালো অক্ষরের অন্তরালের সেই গুটিকয় মানুষ, যাদের কাছে ‘কবিতা বেঁচে থাকা আর বাঁচানোর দিনপঞ্জিকা’, এই বই তেমনি আটজন সংখ্যালঘু মানুষকে নিয়ে। স্পেন্ডার কথিত ‘ terrible journey’-র শেষে

বিপর্যস্ত বিধ্বস্ত এই আটজন। জীবনভর মেধা আর হৃদয়ের সমন্বিত নির্যাস থেকে কবিতার জন্ম দিতে দিতে নিজেকেও নিঃশেষ করে ফেলা আটজন জিজ্ঞাসাপ্রবণ পাঠক আপনার সামনে...

poetry is the inner life of a culture, its nervous system, its deepest way of imagining the world. A culture that ignores its poets chokes off its nervous system and becomes mertally ill.(এরিকা জঙ) এই সমাজসুস্থতার জন্য, ভাষা ও মননকে বাঁচানোর, প্রাণবন্ত রাখার জন্য কবিতাকে যাঁরা একমাত্র জীবনচর্যা করেছিলেন তাঁদের নিয়েই এই ৮টি গদ্য। এ কোনো গবেষণালব্ধ প্রবন্ধ নয়, পরীক্ষার্থীর জন্য মুখে ফেনা তুলে ফেলা সহস্র ব্যবহৃত কাগজের 'নোট' নয়। ব্যক্তি আমার দেখাকেই দেখানোর চেষ্টা মাত্র। আসলে একজন চিত্রশিল্পী, চলচ্চিত্রকার বা নাট্যকর্মীর মত কবিও এগিয়ে থাকা মানুষ, যাকে বাঁচতে হলে নিজের মত করেই বাঁচতে হয়। এই সমাজ সভ্যতার ছাঁচে তা না পারলেই কপালে সেঁটে দেওয়া হয় অস্বীকার ও অপমানের টিকা। ক্রোধ, ঘৃণাঅস্বীকারকে নিয়ে তবুও কবি লেখেন, কবিতা যা জীবনযাপনের মত, জন্মের জন্য সঙ্গমের মত অবশ্যম্ভাবী। নিশ্চিন্তে ঘুমোনোর বিছানা দাউ দাউ করে জ্বলে উঠলে যখন কবি ভাষার ও শব্দের আশ্রয় খোঁজেন, তখনই তাঁর সঙ্গে দেখা হয় কবিতার। এ কোনো স্বপ্নচ্ছয়মণ্ডলে জন্মায় না। মুদ্রারাক্ষসের যাবতীয় অঙ্ক যেখানে পৌঁছতে পারে না। কবি শুধু চিন্তার জগতে স্বপ্নের অনুবাদক হয়েই থাকেন না, উন্নীত করে তোলেন স্বপ্নের স্তরে। এখানে তেমনি কয়েকজন স্বপ্ন পরিব্রাজকের কথা জানাচ্ছি, এখানে কবিতা ও কবি উভয়েই গুরুত্বপূর্ণ ও পরিপূরক। এঁরা কবিতার জন্য, স্বপ্নের জন্য আত্মদহনের পথ নিয়েছিলেন, প্রণম্য হতে হবে এমন কোনো পরিকল্পনাপ্রসূত এই দহন নয়, এ শব্দের ও সৌন্দর্যের জন্য আদিম মত্ততায় অগ্নিকে প্রণম্য করে তাঁকে ঘিরে উদোম নৃত্য, ভেতরে নিষ্কলুষ নির্লোভ ব্যক্তি, তাঁর সমস্ত ক্রোধকে গোপন করে জ্বলতে থাকেন। জীবনানন্দ থেকে শ্যামল সিংহ, পাঠক আপনার সামনে। মুখোমুখি আপনি ও কবি।

কবিতের পোর্ট্রেট স্কেচ করেছেন স্বপন দাস, এই রাগী ও অভিমানী শিল্পীর প্রতিভা ও শিল্প এই বইয়ের সঙ্গে যুক্ত থাকায় আমি কৃতার্থ। এই সংকলনের জন্য খুঁচিয়েছেন, পাশে থেকেছেন বিজয় দে, সমর রায়চৌধুরী, শঙ্কর চক্রবর্তী এবং অবশ্যই সুভাষ কর্মকার, এঁদের শ্রদ্ধা জানাই। জীবনানন্দ সম্পর্কিত লেখাটিসহ বেশ কয়েকটি গদ্য লেখবার সময় এবং লেখবার পরে শ্রদ্ধেয় শঙ্খ ঘোষ এবং তপোধীর ভট্টাচার্যের কাছ থেকে গুরুত্বপূর্ণ পরামর্শ ও স্নেহ পেয়েছি, এঁদের জানাই প্রণাম। সাহিত্যআড্ডায় নিয়মিত আমাকে ঋদ্ধ করেছেন বন্ধুরা : প্রসাদ, রাজদীপ্ত, রণজিৎদা, শৌভিক, শেখরদা, কৌশিক, এঁদের ভালোবাসা ভুলবার নয়। কণ্টকাঁটা সীমান্তের ওপারের আমার বাংলাদেশের স্বজন বন্ধুদের সঙ্গে নিয়মিত কথাবার্তায় এই বই প্রকাশের তাগিদ তীব্র হয়েছে, কৃতজ্ঞতা জানাই বন্ধু সাদ কামালী, সরকার আমিন, ওবায়েদ আকাশ, রাহেল রাজীব, মিণ্টু এবং অবশ্যই মামুন মুস্তাফাকে। আর একজন বন্ধু প্রাবন্ধিক শহীদ ইকবাল, তাঁর সৃজনকর্মের জন্য এবং সুস্থ সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডল তৈরির জন্য আগামী প্রজন্মকে জড়িয়ে নিয়ে এগোনোর চেষ্টা আমাদের আশাবাদী করে, এমন মানুষরা আছেন বলেই আমরা উষ্ণ আলিঙ্গানে মুছে ফেলতে পারি সীমান্তের কাঁটাতারের রূঢ় বিভাজনকে, সংস্কৃতির সেতুবন্ধনে বাঁধার স্বপ্ন দেখি।

এই বইয়ের বেশ কিছু রচনা পূর্বে বিভিন্ন লিটল ম্যাগাজিনে প্রকাশিত হয়েছে। 'জীবনানন্দ' সম্পর্কিত লেখাটির কিছু অংশ *মনন* এবং তারপর *অমৃতলোক*এ, মায়াকোভস্কি, শামসের ও অরুণেশ সম্পর্কিত লেখা ৩টি *কবি সম্মেলন*এ, র‍্যাঁবো সম্পর্কিত লেখাটি দুই অংশে *চান্দ্রমাস* ও *খনন*এ, শামসের সম্পর্কিত রচনার কিছু অংশ *শুধু কবিতার*এ এবং শ্যামল সিংহ সম্পর্কিত লেখাটির একটা অংশ *এখন*এ, ফাল্গুনী রায় সম্পর্কিত লেখাটি *অগ্রবীজ*এ প্রকাশিত হয়েছিল, এইসব সাহিত্যপত্রর কাছে আমি কৃতজ্ঞ। এই বই প্রসঙ্গে যেকোনো মতামত আমাকে জানালে আমি অত্যন্ত সম্মানিত বোধ করব।

বিনীত
গৌতম গুহ রায়

সূচি

- জীবনানন্দ, জলার্ক ও একটি অপূর্ণ ইচ্ছা আশা স্বপ্নের ছাইভস্ম /৮
- একটি দৃষ্টিগম্য আকাশের পরে/অধিক নীলাভ সেই প্রকৃত আকাশ /১৭
- সমরে আমারি আত্মীয় সে /২২
- হলুদ সূর্যের গায়ে আমার হারাকিরির রক্ত লাগুক/২৮
- শামসের : সশস্ত্র এক আধুনিক কবি/৩১
- একটি গান পাতা ঝরাতে ঝরাতে ফুরিয়ে গেলে নদীর জন্ম /৩৭
- একটি ফুল ছিঁড়েছি তাতে ভেঙে গেল পৃথিবী আমার /৪৩
- অস্তির শিশিরবিন্দু মুঠো করে মিশে যাবে ঘামে /৪৮
- অরুণেশ ঘোষ : এক দলছুট বিপথিক কবি /৫১
- জাঁ আর্তুর র‍্যাঁবো : উন্মাদ সৌরকণা /৫৪
- ১৪ এপ্রিল : এক ট্রাউজার পরা মেঘের মৃত্যু /৫৮
- হাংরি ফাল্গুনী রায়: আত্মার খিস্তি ও চিৎকার /৬১

কোনদিন মানুষ ছিলাম না আমি,
হে নর হে নারী,
তোমাদের পৃথিবীকে চিনি নি কোনদিন
...
গভীর অন্ধকারের ঘুমের আস্বাদে আমার আত্মা লালিত;
আমাকে কেন জাগাতে চাও?

জীবনানন্দ, জলার্ক ও একটি অপূর্ণ ইচ্ছে
আশা স্বপ্নের ছাই ভস্ম

'জলপাইগুড়ি যেতে লিখেছ। একবার গিয়ে ঘুরে আসতে ইচ্ছা করে। সভাসমিতি ইত্যাদি সবকিছুর হাত সম্পূর্ণভাবে এড়িয়ে তোমাদের দু-একজনের সাহায্যে হিমালয়, চা-বাগান ইত্যাদি দেখে আসবার লোভ জেগেছে মনে।' ১৯৫১-র ২৮ মে ১৮৩ ল্যান্সডাউন রোডের বাড়ি থেকে উত্তর বাংলা জলপাইগুড়ি শহরের তরুণ সুরজিৎ দাশগুপ্তকে চিঠিতে এই ইচ্ছের কথা জানিয়েছিলেন জীবনানন্দ। পঞ্চাশ-ঊর্ধ্ব এই কবির সেই ইচ্ছে পূর্ণ হয়নি, হিমালয়, চা-বাগান দেখে আসবার ফুরসৎ হল নাতাঁর আত্মদহনে ছটফট করতে থাকা মানুষটা তার যাবতীয় অনিচ্ছা অতৃপ্তির সঙ্গে সহবাস করতে করতে ইচ্ছেগুলোকে হারিয়ে ফেলছিলেন। এই হারানোর যন্ত্রণাগুলোকে চেপে রেখে ব্যক্তিজীবনে আপোষকামী হয়ে যেন নিজেকেই কুঁড়ে কুঁড়ে খাচ্ছিলেন তিনি। উল্লিখিত চিঠির সূত্রেই সুরজিৎবাবু তাঁর শহরের কিছু নিসর্গ দৃশ্যের ফটোগ্রাফ পাঠিয়ে দেন। 'নগ্ন নির্জন' শহরের ছবি। জীবনানন্দ উত্তরে লিখলেন 'জলপাইগুড়ির ঝিল, হাঁস ও শিরীষ গাছের যে সব ছবি পাঠিয়েছ অপূর্ব বোধ হল। এখুনি ঝিলের পারে ঘাসের ওপরে আকাশের মুখোমুখি নিজেকে ছড়িয়ে দিতে ইচ্ছে করছে। নদী, ঝিল, পাহাড়, বন, আকাশ, কোনো নিরালা জায়গা থেকে এসবের নিকট সম্পর্কে আসতে ভালো লাগে আমার। বসে থাকতে পারা যায় যদি এদের মধ্যে, কিংবা হেঁটে বেড়াতে পারা যায় সারাদিন, তা হলেই আমাদের সময় একটা বিশেষ দিক দিয়ে (আমার মনে হয়) সবচেয়ে ভালোভাবে কাটে।' নির্জনতা ও বিষণ্ণতায় আক্রান্ত জীবনানন্দের, প্রকৃতি ও মানবতার ছায়া-আচ্ছন্ন জীবনানন্দের ভালোলাগার ছোট ছোট টুকরোগুলো এমনই ছিল। ঝিলের গায়ে ঘাসের ওপরে আকাশের মুখোমুখি নিজেকে ছড়িয়ে দিতে চাওয়া কবির ভালোবাসার ইচ্ছেগুলোও ছিল ভেসে বেড়ানো মেঘের মতো, শুভ্র ও খণ্ডখণ্ড, নিঃস্বার্থ ও উচ্চাশাহীন এই সব ভালোলাগার জলভরা সতেজ বাতাস সজীব রেখেছিল 'শুদ্ধতম কবি' জীবনানন্দকে। এইসব ভালোলাগার ইচ্ছের অধিকাংশ সময়ই ইচ্ছেপূরণের আনন্দে উত্তীর্ণ হয় নি, এই অপ্রাপ্তির যন্ত্রণার দহনে দগ্ধ হয়েছেন তিনি নীরবে। শহর জলপাইগুড়ির, তিস্তাপারের প্রকৃতি-নিবিড় শহরের, পাঁচ দশক আগের ঝিল, বিল, শিরীষ ঢাকা সবুজ ছবি তাঁকে পাঠিয়েছিলেন *জলার্ক*এর সুরজিৎ দাশগুপ্ত। ছবির প্রকৃতি তাঁকে উসকে দিয়েছিল, আসতে চেয়েছিলেন এখানে। কিন্তু হিমালয় পাদদেশের অরণ্যসংলগ্ন এই জলপাইগুড়িতে আর আসা হয়নি তাঁর। পঞ্চান্নোবছর আগের কবিও তখন পঞ্চাশোর্ধ্ব, তাঁর ইচ্ছের সাক্ষী থেকে গেছে শুধু কয়েকটি চিঠি। সময়-জব্দ জীবনানন্দের অব্যক্ত যন্ত্রণার চিহ্ন নিয়ে কয়েকটি পোস্টকার্ড।

জীবনানন্দের ৫৫ বছরের জীবনে ১৯১৯-এ *ব্রহ্মবাসী* পত্রিকায় প্রকাশিত(বৈশাখ ১৩২৬) 'বর্ষ-আবাহন' কবিতা থেকে শুরু ধরলে কবিজীবন মাত্র ৩৪ বছরের, প্রকৃত বিচারে যদিও কবি জীবনানন্দের আয়ুস্কাল আরও কম। এই কবি প্রধানত ছোটকাগজের লেখক। ভূমেন্দ্র গুহর ভাষায় 'জীবনানন্দ আজীবন ছোটো কাগজের দাবি মেনে চলেছেন, এবং মানতে ভালোবসেছেন, যদিও বড়ো কাগজে যথোপযুক্ত মর্যাদা সহকারে লেখা বেরোক,

তাও তাঁর কাম্য ছিল; (যদিও তাঁর সেইচ্ছা যে সব সময় পরিপূরিত হয়েছে, তা বলা যায় না।) ছোটকাগজগুলি অবশ্য জীবনানন্দ সম্বন্ধে তুলনামূলকভাবে বেশি উৎসাহী ছিল মনে হয়। 'এই উৎসাহের কারণে জীবনানন্দর সঙ্গে উত্তর বাংলার কিছু তরুণের যোগাযোগ হয়ে গিয়েছিল পাঁচের দশকেই। 'নগ্ন নির্জন শহর' জলপাইগুড়ির সঙ্গে কবির এই সম্পর্কের সেতু ছিল *জলার্ক* সাহিত্য পত্রিকা। ১৯৫২–তে সুরজিৎ দাশগুপ্ত ও বনবিহারী দত্ত *জলার্ক* প্রকাশ করেন এ শহর থেকে। সঠিক অর্থে তিস্তাবঙ্গে এই *জলার্ক*ই সূচিত করে লিটল ম্যাগাজিন আন্দোলনের। তৈরি হয় স্বতন্ত্র ও নিজস্ব সাহিত্য পরিমণ্ডল। এই কাগজটির সূচনা প্রসঙ্গে দেবেশ রায় লিখেছেন, 'সেটা ৫০–৫১ সাল হবে। আমি ইশকুল থেকে বেরোই নি আর দাদারা বোধ হয় কলেজের পাঠ শেষ করেছেন। জলপাইগুড়ি থেকে সুরজিৎদা, দাদা (দিনেশ রায়), বনবিহারীদা ও আরও দু–একজন মিলে একটি কাগজ বের করলেন। তার নাম দিয়েছিলেন প্রেমেন্দ্র মিত্র। *জলার্ক* ও তৎকালীন শহর জলপাইগুড়ির প্রথম আধুনিক নাগরিক সাহিত্যপত্র। সুরজিৎদা সম্পাদক ছিলেন।' এই *জলার্ক* ও তৎকালীন শহর জলপাইগুড়িতে ক্রমশই এক সারস্বত সাধনার পরিমণ্ডল তৈরি হয়েছে। তৈরি হয়েছে এক অন্য মেজাজের সাহিত্য পরিমণ্ডল। কার্তিক লাহিড়ী, দিনেশ রায়, তাঁর ভাই দেবেশ রায়, সুরজিৎ বসু প্রমুখ। সাহিত্য আড্ডারও এক তাজা বাতাস তখন তিস্তা কল্লার বাতাসে মিশে যাচ্ছে। *জলার্ক*এর পথ ধরেই সুরজিৎ দাশগুপ্তর যোগাযোগ জীবনানন্দের সঙ্গে। যা ক্রমশ নিবিড় হয়ে ওঠে। কবি বেশ কয়েকটি চিঠিতে এখানে আসার ইচ্ছে ব্যক্ত করেন। সুরজিৎবাবু জীবনানন্দের তৃষাতুর চোখের সামনে তুলে ধরেছিলেন কিছু ছবি, নগ্ন নির্জন শহরের ছবি। তিস্তা ও করলা দুই বহতা নদী বুকে নিয়ে বয়ে থাকা উত্তর বাংলার এই শহর জলপাইগুড়ি তখনও এক শান্তি ও নির্জনতার ঘোমটা টেনে রেখেছে। জ্যাকসন মেডিক্যাল স্কুল সংলগ্ন চত্বর হয়ে ওঠে নি আজকের বিস্তৃত বৃহৎ জেলা হাসপাতাল। ছোট মেডিক্যাল স্কুল জুড়ে বিশাল ও ব্যাপ্ত শিরীষ গাছের ছায়া, ছোট ছোট ঝিল, গা ঘেঁষে বয়ে যাওয়া শান্ত করলা নদী। সুরজিৎবাবুর পাঠানো এই ছবিগুলো ধরে রেখেছিল এই শিরীষের ছায়া, ঝিলের শ্যাওলা ঢাকা নিস্তরঙ্গ জল, হাঁসের অলস বিশ্রামে জলে ও পারে বসে থাকা। দেবেশ রায় স্মৃতিচারণায় লিখেছেন–'আমরা যখন ইস্কুলে, জলপাইগুড়িতে একটি মেডিক্যাল স্কুল ছিল জ্যাকশন মেডিক্যাল স্কুল।...মেডিক্যাল ইস্কুলটি দেখতে এতই সুন্দর যা কখনো ভোলা গেল না, থেকে থেকেই মনে পড়ে। তা ছাড়া, স্কুল উঠে গেলেও তার বাড়ি, মাঠ, ঝিল, গাছগুলো তো আর উঠে যায় নি।...এখন সেখানে ফার্মেসি ট্রেনিং সেন্টার। মাঝখানে অর্ধেক গোল একটা গড়নের দুদিকে ছড়িয়ে গেছে পলেস্তরাহীন লাল ইঁটের বারান্দাসহ ঘর। খিলানের উপর লর্ড মাউন্ট। সামনে অন্তত দুটো ফুটবল মাঠ হয়, সবুজের এমন সমতল। পশ্চিমে একটা ঝিল। সেই ঝিলের পাশে আকাশ ছোঁয়া মহীরুহের সারি, বৃষ্টির সময় সেগুলোর নীচে দাঁড়ালে জল লাগতো না। বৃষ্টি থেমে গেলে সেগুলোর পাতা থেকে জল ঝরে পড়তে থাকত।' এইসব ঝিলের, সবুজ ছবি পেয়ে আপ্লুত জীবনানন্দ তৎক্ষণাৎ লেখেন এক নাতিদীর্ঘ চিঠি। জীবনানন্দের চিঠি লেখা প্রসঙ্গে সুরজিৎবাবুর স্মৃতিচারণায়–'দাদা ছুটিতে প্রেসিডেন্সি কলেজ লাইব্রেরি থেকে নিয়ে এলেন আবু সয়ীদ ও হীরেন্দ্রনাথ সম্পাদিত ও কবিতাভবন প্রকাশিত *আধুনিক বাংলা কবিতা।* তখন কবিতাভবন থেকে জীবনানন্দ দাশ, সুধীন্দ্রনাথ দত্ত ও সুভাষচন্দ্র মুখোপাধ্যায় এই তিনজনের ঠিকানা আনাই। কিন্তু কেন জানি না চিঠি লিখি শুধু জীবনানন্দকেই। উত্তর নেই। তবে কি তিনি আমার চিঠি পান নি? না কি তাঁর উত্তরটা আমার হাতে পৌঁছায় নি? আবার চিঠি দিলাম। আধুনিক সাহিত্য, বিশেষত, আধুনিক বাংলা কবিতা সম্বন্ধে উত্তরবঙ্গের মানুষের জন্য একটা পত্রিকা প্রকাশ করতে চাই। আপনার কবিতা চাই। অবশেষে জীবনানন্দের পোস্টকার্ড এল।...জীবনানন্দের পর্যায়ের কবি কত অনায়াসে 'শিরীষের ডালপালা লেগে আছে বিকেলের মেঘে' কবিতাটি মফঃস্বলের না দেখা ও সাক্ষাৎপরিচয়হীন সদ্য কৈশোর অতিক্রান্ত ছাত্রদের পত্রিকা প্রকাশের পরিকল্পনার উত্তরে পাঠিয়েছিলেন একথাটা আজ যখন ভাবি তখন অবাক হয়ে যাই। এর মধ্যে তাঁর চরিত্রের 'আরো এক বিপন্ন বিস্ময়' প্রকাশ পায় বলে মনে হয়, যার অস্তিত্ব অর্থ, কীর্তি ও সচ্ছলতার অতীত।'

মফঃস্বল শহরটির আন্তরিক স্পর্শ টের পেয়েছিলেন স্পর্শকাতর মানুষটি। এর সঙ্গে ছবি ও বর্ণনার টানে জলপাইগুড়ির প্রতি অন্য একটা অন্তর্গত টান জন্মে গিয়েছিল তাঁর মধ্যে। মনের গভীরে দাগ ফেলেছিল এই শহর। পরবর্তী বছরগুলোতে তাঁর লেখা চিঠি ও বিভিন্ন রচনায় এর ছায়া লক্ষ করা যায়। ১৯৫২–র ২০ জানুয়ারি আবার তিনি সুরজিৎবাবুকে লেখেন–'তুমি election সম্পর্কে যে একা একা নানা জায়গায় বিশেষত বনে জঙ্গালে ঘুরে বেরিয়েছ তার বর্ণনা পড়ে চমৎকার লাগল। জলপাইগুড়ির ওদিককার অঞ্চল, পাহাড়, নদী, জঙ্গাল বেশ দেখবার মতো, ঘুরে বেড়াবার মতো, আমার খুব যেতে ইচ্ছে করে, জলপাইগুড়ির দিকে একবার যাব ভাবছি, কিন্তু কবে হয়ে ওঠে বলতে পারা যাচ্ছে না।' কিন্তু কবির ইচ্ছা অপূর্ণই থেকে গেছে। সেই বছরই মে মাসে কবি লেখেন–'আমার এখন জলপাইগুড়ি যাবার কোন সম্ভাবনা নেই। যেতে পারলে অবশ্য আনন্দিত হতাম। পরে কখনও যাবার চেষ্টা করব।' অসুস্থতা, বেকারত্ব পারিবিারিক অশান্তিতে বিপর্যস্ত কবি যেন এ সময় তাঁর ভালো লাগার জগৎ থেকে ক্রমশ ছিটকে

যাচ্ছেন। এমনকি, কবিতাও লিখতে পারছিলেন না এ সময়। কবি কায়সুল হককে এ সময় একটি চিঠিতে তিনি একথা লিখেছিলেন। ১৯৫২ সালের ২৬ জুন তিনি জানালেন–' নানা কারণে মন এত চিন্তিত আছে, শরীরও এত অসুস্থ যে অনেকদিন থেকেই কিছু লিখতে পারছি না।'

গত অর্ধ শতকে জলপাইগুড়ি অনেক পাল্টে গেছে। 'নগ্ন নির্জন শহর'–এ আজ কংক্রিটের দাপট। প্রমোটারি নির্মাণে আকাশ ছোট হয়ে আসছে ক্রমশ। সুরজিৎবাবু কবিকে যে ছবি পাঠিয়েছিলেন সে সব ছবিতে যা ছিল তার অনেক অনেকটাই এই সময়ে উধাও। সুরজিৎবাবু লিখেছেন–'সদর হাসপাতালের লাগোয়া দক্ষিণে আমাদের জলপাইগুড়ির বাসার সামনে ছিল মেডিকেল স্কুলে ঝিল, ঝিলের ধারে সারি সারি শিরীষ গাছ আর তার পেছনে ছিল স্কুলবাড়ি ও বিশাল খেলার মাঠ। শুনেছি, এখন সে মাঠও নেই, আর মেডিকেল স্কুল বলে ব্যাপারটাই সরকার কর্তৃক বাতিল হয়ে গেছে। কিন্নতু যখন মেডিকেল স্কুল ছিল তখন তার লাগোয়া লাশকাটার ঘরও ছিল। মধ্যে মধ্যে লোহার ঢাকনি দেওয়া একটা গোরুর গাড়ি যেটা লাশ নিয়ে যেত শ্মশানের দিকে। তার বিকট গন্ধ অনেকক্ষণ পর্যন্ত ভাসত পথের বাতাসে। ছোটবেলায় কয়েকবার বড়দের উপর রাগ করে বাড়ি ছেড়ে সেই লাশকাটা ঘরের বারান্দায় রাত কাটিয়েছি। সে কথা শুনে জীবনানন্দ জানতে চেয়েছিলেন যে তখন আমার কেমন লাগত, কিছু চোখে দেখেছিলাম কি না। যতদূর মনে পড়ে তখন আমার পাল্টা প্রশ্নের উত্তরে তিনি একথাও বলেছিলেন বরিশালের লাশকাটা ঘরের বাইরের দৃশ্যটাই তিনি দেখেছেন, কিন্নতু কখনও ভেতরের দৃশ্য দেখেন নি। 'আট বছর আগের একদিন' কোনও প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার সূত্রে নয়, সবটাই প্রগাঢ় অনুভূতির ভিত্তিতে লেখা। কিছুটা শোনা কথা বা পড়া কথা, কিছুটা পরোক্ষ অভিজ্ঞতা, কিছুটা নিজস্ব কল্পনা, কিছুটা ভাবনা, কিছুটা সাধনা এইসব কিছু মিলেমিশে কবিতা।' আজকের জলপাইগুড়ি শহরে সেই মেডিক্যাল স্কুল আজ ফার্মেসি ইনস্টিটিউট(বি.ফার্ম ডিগ্রি কলেজ), প্রশান্তি ছড়িয়ে দুটো শিরীষ গাছ এখনও ছায়া মেলে ধরে থাকলেও পেছনের গাছগুলো আর নেই। শুধু জীবনানন্দের অপূর্ণ ইচ্ছার মতই বিস্মৃতির অতলে ক্ষীণ বুদ্বুদের মত যেন দুই মহীরূহ এখনও দীর্ঘ থেকে দীর্ঘতর ছায়া নিয়ে দাঁড়িয়ে। উত্তরবাংলা এই জনপদ থেকে কবিতাপাগল কিশোরদেরকে জীবনানন্দ নৈকস্থ এনেছিল *জলার্ক* সাহিত্য পত্রিকা। এ শুধু জলপাইগুড়িই নয় উত্তরবাংলার সাহিত্যজগতেও এক নতুন বাতাসের সতেজ ধাক্কা ছিল। প্রভাতকুমার দাস তাঁর *জীবনানন্দ* জীবনী গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন : সুরজিৎ দাশগুপ্ত জলপাইগুড়ির ছেলে হলেও কলকাতার সাহিত্যিক মহলে অনেকের সঙ্গে নিজের আগ্রহে প্রায় কিশোর বয়স থেকেই ঘনিষ্ঠতার সুযোগ পেয়েছিলেন। ১৯৫০–এ ষোল(১৬) বছর বয়সে ম্যাট্রিক দেওয়ার পর 'বনলতা সেন' পড়ে জীবনানন্দের প্রতি গভীর আকর্ষণ বোধ করেন। স্কুলে পড়তে পড়তেই প্রেমেন্দ্র মিত্রের ভক্ত হয়ে হয়ে পড়েছিলেন। তাঁর সঙ্গে পত্রালাপও ছিলো। আধুনিক কবিতার প্রচার করার উদ্দেশ্য নিয়ে একটি পত্রিকা প্রকাশের ইচ্ছা জাগলে, প্রেমেন্দ্র তাঁকে উৎসাহ দিয়ে জলপাইগুড়ির সঙ্গে মিলিয়ে পত্রিকাটির নাম *জলার্ক* (প্রথম প্রকাশ আষাঢ় ১৩৫৯) রাখতে পরামর্শ দেন। সুরজিৎবাবুদের সম্পর্কে তাঁর একসময়ের ঘনিষ্ঠ কথাকার দেবেশ রায় *বিভাব*এ লিখেছিলেন–'আমার মাসিমা জলপাইগুড়ির আধুনিক নাগরিকতার প্রতীক। মনিহারি ঘাটে নেমে লেডি ডাক্তারের কাছে যাব বললে স্টেশনের কুলিরাও হদিস দিতে পারত কোন ট্রেন ধরতে হবে। গঙ্গার উত্তরের পারে আমাদের মাসিমা ছাড়া দ্বিতীয় কোনো লেডি ডাক্তার ছিলেন না।...মাসিমা তার আধুনিকতা দিয়ে জলপাইগুড়ির বাবুদের আভিজাত্য চর্চার সুযোগ দিয়েছিলেন। আধুনিকতাকে যে কে কখন কীভাবে ব্যবহার করে! সেই চারের দশকে মাসিমা শুধু লেডি ডাক্তার ছিলেন না, তাঁর জীবনের দিক থেকে ছিলেন ভবিষ্যতের এক আধুনিক মানুষ। তাঁর স্বামী তাঁকে ছেড়ে চলে গিয়েছিলেন, মাসিমা তাঁর দুই ছেলেকে নিয়ে তখনকার দিনে দুই পায়ে দাঁড়িয়ে ছিলেন। মাসিমার এই দুই ছেলে–গোপাল আর ভূপাল, এখন এঁরা খ্যাতনামা অধ্যাপক রণজিৎ দাশগুপ্ত ও ও সাহিত্যিক সুরজিৎ দাশগুপ্ত।'

জলার্ক থেকে একটি কবিতা সংকলনও বেরিয়েছিল, *সূর্যতামসী*। প্রেমেন্দ্র মিত্র, জীবনানন্দ থেকে শঙ্খ ঘোষের কবিতা ছিল এতে। *জলার্ক*এ পাঠানো জীবনানন্দর কবিতাটি প্রতিশ্রুতির একমাসের মধ্যেই কবি পাঠিয়ে দিয়েছিলেন 'শিরীষের ডালপালা', ১৯৫১–র ১৪ অক্টোবর সুরজিৎবাবুকে তিনি লেখেন–'তোমাকে যে কবিতাটি দিয়েছিলাম তা এবারকার *কবিতায়* বেরিয়েছে দেখলাম। ঐ কবিতাটি তোমাদের পত্রিকাতেও ছাপিয়ে দিতে পারো, *কবিতায়* একটু ছাপার ভুল আছে, 'কোরালীর প্রাণ' হবে। এ প্রসঙ্গে সুরজিৎবাবুও লিখেছেন: 'কবিতাটি *জলার্ক*এ পাঠানোর পরপরই কবিতা পত্রিকায় প্রকাশিত হয়, কিন্নতু মুদ্রণপ্রমাদ থাকায় তা *জলার্কে*র বিলম্বিত প্রথম সংখ্যায় ছাপা হয়, মুদ্রণপ্রমাদহীনভাবে। শিরীষের গল্প কবিতাটি সম্ভবত উত্তরবাংলার কোনো কাগজে মুদ্রিত জীবনানন্দর প্রথম কবিতা। পরবর্তীকালে তা *বনলতা সেন* কবিতাগ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত হয়, ১৯৫২ সালে 'কবিতা ভবন' প্রকাশিত *এক পয়সায় একটি* গ্রন্থমালায় অন্তর্ভুক্ত *বনলতা সেন*র ১২টি কবিতা ছিল। ১৯৫২ সালে এই কবিতার গ্রন্থের প্রথম সিগনেট সংস্করণ প্রকাশিত হয়। প্রকাশক দিলীপকুমার গুপ্ত, প্রচ্ছদপট সত্যজিৎ রায়ের। এই গ্রন্থে ৩৩টি কবিতা ছাপা হয়। দাম ২টাকা। ২৩তম কবিতাটি 'শিরীষের ডালপালা'।

শিরীষের ডালপালা লেগে আছে বিকেলের মেঘে,
পিপুলের ভরা বুকে চিল নেমে এসেছে এখন,
বিকেলের শিশু সূর্যকে ঘিরে মায়ের আবেগে
করুণ হয়েছে ঝাউবন।
নদীর উজ্জ্বল জল কোরোলের মতো কলরবে
ভেসে নারকেল বনে কেড়ে নেয় কোরালীর ভ্রূণ;
বিকেল বলেছে, এই নদীটিকে; 'শান্ত হতে হবে'
অকুল সুপুরিবন স্থির জলে ছায়া ফেলে এক মাইল শান্তি কল্যাণ
হয়ে আছে। তার মুখ মনে পড়ে এরকম স্নিগ্ধ পৃথিবীর
পাতাপতঙ্গের কাছে চলে এলে; চারিদিকে রাত্রি নক্ষত্রের আলোড়ন
এখন দয়ার মতো; তবুও দয়ার মানে মৃত্যুতে স্থির
হয়ে থেকে ভুলে যাওয়া মানুষের সনাতন মন।

উল্লেখ্য, সিগনেট সংস্করণেও রয়ে গেছে 'কোরালীর ভ্রূণ' অথচ জীবনানন্দর সংশোধনী অনুযায়ী *জলার্ক*এ ছাপা হয়েছিল 'কোরালীর প্রাণ'। কিন্তু সিগনেট সংস্করণ–এ কবিতা পত্র–এর ভুল নিয়েই থেকে যায়। 'কোরালীর ভ্রূণ' যে জীবনানন্দের 'কোরালীর প্রাণ' এই সংশোধনী চেহারা *জলার্ক* দিলেও অদ্যাবধি সমস্ত গ্রন্থ সংস্করণেই 'ভ্রূণ'–ই থেকে গেছে। সাম্প্রতিককালে *জীবনানন্দ সমগ্র*তেও 'ভ্রূণ' রয়ে গেছে 'ভুল' নিয়ে।

আলোচ্য চিঠিগুলো যে সময় জীবনানন্দ লিখেছিলেন, ১৯৫১–৫২, যখন তিনি চাইছেন জলপাইগুড়ির মত কোনো সবুজ প্রকৃতি–ঘন জায়গায় আশ্রয় নিতে। তখন চারপাশ তাঁর কাছে রূঢ় হয়ে উঠেছিল। রূঢ় বাস্তবের মুখোমুখি অসহায় অবস্থা তাঁর। প্রতিটি ইচ্ছা ও কামনার মৃত্যু পরখ করছেন প্রতিদিন। ১৯৫০–এর ২রা সেপ্টেম্বর তিনি খড়গপুর কলেজে অধ্যাপনার কাজে যোগ দেন, সদ্য প্রতিষ্ঠিত এই কলেজে নামমাত্র মাইনে পেতেন। স্ত্রী লাবণ্য ডেভিড হেয়ার ট্রেনিং কলেজে বি.টি পড়তে শুরু করেন এসময়। কিছুদিনের মধ্যেই তিনি 'এনকাইলা' রোগে অসুস্থ হয়ে পড়েন। ১৯৫১–র জানুয়ারি, অসুস্থ স্ত্রীর অসুস্থতার খবরে কলকাতা আসেন কবি। লাবণ্যদেবী সুস্থ হচ্ছেন না দেখে ছুটির সময় বাড়ানোর আবেদন করেন কলেজ কর্তৃপক্ষের কাছে, কিন্তু কলেজ কর্তৃপক্ষ ২৫ ফেব্রুয়ারি তাঁকে বরখাস্ত করে দেয়। এসময় সহকর্মী পুলিনবিহারীকে কবি লেখেন, 'বড়ই বিপদের ভেতর আছি। খড়গপুর কলেজ থেকে ডিসেম্বর ও জানুয়ারিতে তিনশত টাকা পেয়েছিলাম। ফেব্রুয়ারি মাসে যে কাজ করেছিলাম, সে পাওনা আজ পর্যন্ত পাই নি। অন্তত পূর্বের মাইনে না পেলে এই দুর্দিনে কিছুতেই টিকে থাকতে পারব না।' এ সময় চরম বেকারত্বের। তাঁর কাঁধেই সমস্ত সংসারের ভার। বাড়ি নিয়ে পরিবার নিয়ে তাঁর শত দুশ্চিন্তা। খড়গপুরের কলেজের সাড়ে পাঁচ মাস মেয়াদি চাকরি চলে যাওয়ার পর সম্পূর্ণ বেকারত্ব তাঁকে অসহায় অবস্থায় ঠেলে দেয়। শুরু হয় আবার চাকরির খোঁজ। ১৯৫১ সালে এশিয়াটিক সোসাইটির রিসার্চ এ্যাসিস্টেন্টের জন্য দরখাস্ত করেন কবি। প্রার্থী হন চারুচন্দ্র কলেজে অধ্যাপনার জন্য। এসব ছেড়ে একসময় ব্যবসায় নামার সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছিলেন তিতিবিরক্ত হতাশ জীবনানন্দ। এ সময় তাঁর সবচেয়ে বড় সম্পদ আত্মবিশ্বাসেও ফাটল ধরছিলো। অধ্যাপনা বা পড়ানোর কাজ তাঁর খুব একটা পছন্দের ছিল না, তবুও হন্যে হয়ে খুঁজেছেন। ভাইবৌ নলিনী চক্রবর্তীকে তিনি অধ্যাপনা সম্পর্কে লিখেছিলেন–'অধ্যাপনা, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান সে সবের বর্তমান অবস্থা সম্পর্কে আপনি যা লিখেছেন ঠিকই। তবে অধ্যাপনা জিনিষটা কোনো দিনই আমার তেমন ভালো লাগে নি। যে সব জিনিষ যাদের কাছে যেমনভাবে শিক্ষা দেওয়া হচ্ছেততাতে আমার বিশেষ আস্থা নেই। একাজে মন তেমন লাগে না, তবু সময় বিশেষে অন্য কোনো প্রেরণার চেয়ে বেশী জাগে তা স্বীকার করি।' প্রভাতকুমার দাস এ প্রসঙ্গে লিখেছেন–'শিক্ষকতাকে পেশা হিসেবে গ্রহণ করেও, সন্নতুষ্ট ছিলেন না, সম্ভবত নিশ্চিন্ত কোনো শিক্ষকতা কোনো দিন পান নি বলে।'

একটা কাজের খোঁজে হন্যে হয়ে উঠেছিলেন, চিঠি লিখেছিলেন শিক্ষকতা/অধ্যাপনা চাকরির খোঁজের জন্য হরপ্রসাদ মিত্র, নরেশ গুহ কিংবা অনিল বিশ্বাসকে। হরপ্রসাদ মিত্রকে লিখেছিলেন–'অমৃতবাজার পত্রিকায় দেখা গেছে, কলকাতার কয়েকটি প্রথম শ্রেণীর কলেজে ইংরেজি শিক্ষক নেওয়া হবে। কিন্নতু কলেজের নামের পরিবর্তে পোস্টবক্স নম্বর ব্যবহৃত হবে বলে বুঝতে পারছি না স্কটিচার্চ অথবা সিটি কলেজের প্রয়োজনে এই বিজ্ঞাপন।'

মুর্শিদাবাদের সরকারি আমলা অনিল বিশ্বাসকে লেখা তাঁর চিঠির মধ্যেও কবির বিপন্নতা ধরা আছে–'বর্তমানে অত্যন্ত অসুবিধায় আছি, কাজ খুঁজছি। কলকাতায় একটা সাধারণ কাজও পাওয়া যাচ্ছে না। জঙ্গীপুর কলেজে একজন ইংরেজি শিক্ষক নেওয়ার বিজ্ঞাপন দিয়েছে, আমার বর্তমান অবস্থা এমন যে এরকম কাজ করতে আমি কোনোরকম দ্বিধা করব না।' অথচ, আমরা জানি তিনি কলকাতাকে আঁকড়ে ধরেই থাকতে চেয়েছিলেন, বুদ্ধদেব বসুকে লিখেছিলেন–'কলকাতার অলিগলি মানুষের শ্বাস রোধ করে বটে, কিন্নতু কলকাতার ব্যবহারিক জীবনে একটা প্রান্তরের মত মুক্তি পাওয়া যায়; এখন যখন জীবনে কর্মবন্ডলতার ঢের প্রয়োজন, কলকাতায় এই স্বচ্ছন্দ পটভূমি থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে থাকা চলে না আর।' এখানে উল্লেখ করতে হয় নলিনী চক্রবর্তীকে লেখা তাঁর

উক্তি–'বরাবরই আমার আত্মোহতি ও জীবিকা নিয়ে কলকাতায় থাকার ইচ্ছা।' সাম্প্রতিক উদ্ঘাটিত তাঁর ডাইরিতে লেখা কথাগুলো জীবনানন্দের এই চাওয়া–পাওয়ার সংঘাত, অপছন্দের চেহারা চিনতে সাহায্য করবেত

9.8.31 very often...I think that instead of frittering away my energy. I ought to just do that for wh I Hand & in wh I exel of delight & wh is my true vocation. Literature(press & publication) through a profession or calling wh nourishes it as I city coll or non beng jobs never will...

-Have I ever paid a single pice to I coll street widow or various other beggars?

-The leper's child & various other infants with duress appeal & reflections infibite on them.

-on.....they stand & run & tthrob & palpitute it is only I well- placed who have I eternal charm of the easy chair or cushions, so far & bels for them.

ডাইরিতে এমন কথাটুকরো তিনি লিখেছিলেন খড়গপুরের কলেজের চাকরি হারানোর অনেকদিন আগেই। ১৯৫১–তে যে দুর্বিষহ আর্থিক চাপ তাঁর উপর নেমে আসে তাতে একসময় বিপন্ন জীবনানন্দ জনৈক পরিচিতের সঙ্গে ব্যবসায় নামার সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছিলেন, যদিও তা শেষপর্যন্ত ভেঙে যায়। খা খা বেকার সংসারের চাপে জীবনানন্দ প্রত্যহ খবরের কাগজে বিজ্ঞাপনের কলম থেকে বিভিন্ন কাজের খোঁজ নিয়ে আবেদন করতে থাকেন। তাঁর এরকম অসহায় জীবনের অর্থাৎ কর্মহীন পর্বে একবার পরিচিতদের পরামর্শে দেখা করতে গিয়েছিলেন রাইটার্স রেভিনিউ বোর্ডের সদ্য আই সি এস সত্যেন ব্যানার্জীর সঙ্গে। দেখা করতে গিয়ে রীতিমত অসুস্থ হয়ে পড়েন, রাইটার্স বিল্ডিংয়েই অবনীমোহন কুশারীর ঘরে তিনি অচৈতন্য হয়ে পড়েছিলেন।

কিন্নতু কোথাও চাকরি জোটে নি ইংরাজী সাহিত্যে এম.এ সে সময়ের এই (কবির) যুবকের। অন্তর্মুখী স্বভাবের জন্য ব্যবসাও করতে পারেন নি। পরের বছর চাকরি পেলেন তাঁর স্ত্রী লাবণ্য। এ সময় চার মাসের জন্য চাকরি পান জীবনানন্দ, ১৯৫২–র নভেম্বর থেকে ১৯৫৩–র ফেব্রুয়ারি, বড়িশা কলেজে শিক্ষকতার। কিন্নতু এখানেও থাকা হয়নি। স্বাভাবিকভাবেই যখন তাঁর মন শিরীষের ছায়ায়, ঝিলের হাঁসেদের সঙ্গে ডুব দিতে চেয়েছি, তখন দারিদ্র ডুবে যাওয়ার ব্যক্তিমানুষ জীবনানন্দকে দুঃস্বপ্নের মধ্যে থাকতে হয়েছে, অপূর্ণ অতৃপ্ত বাসনাকে সঙ্গী করে। 'নারীর হৃদয় প্রেম–শিশু গৃহ নয় সবখানি' এক অসহ্য যন্ত্রণাকে সঙ্গী করে 'সবুজ পল্লবিত জারুলের ঐশ্বর্য, হেলিওট্রোপ রঙের ফুল, মেহেদিপাতার বনে স্বপ্নাতুর ঝিঁ ঝিঁ, ছাতীমের গাঙ শালিকের জীবনোচ্ছ্বাস কৃষ্ণচূড়ার অজস্র কুঁড়ি, চারদিককার সফল প্রচুর জীবনের কালীদহ, কলরব কিছুই আমাকে সাহায্য করতে পারে না। (জামরুলতলা) এ সময়ের যন্ত্রণাদগ্ধ কবির আরও অনুরণন চিহ্ন: এ যুগে কোথাও কোনো আলো, কোনো কান্তিময় আলো চোখের সম্মুখে নেই যাত্রীর/ নেই তো নিঃসৃত অন্ধকার মায়ার মতো। এই সময়কালে তিনি এতটাই বিপন্ন ছিলেন যে কবিতাও লিখে উঠতে পারছিলেন না। এ সময়ের একটা ঘটনা উল্লেখ করা যেতে পারে। সুরজিৎ দাশগুপ্ত একবার জলার্কের জন্য বুদ্ধদেব বসুর কাছে লেখা চাইতে তিনি প্রকাশিত ও অপ্রকাশিত লেখার জন্য পৃথক দর উল্লেখ করেছিলেন। সুরজিৎবাবু এ কথা জীবনানন্দকে জানিয়ে তাঁর কোন দর আছে কি না জানতে চাইলে জীবনানন্দ লেখেন–'একটি কবিতার জন্য সম্মানমূল্য আমি সাধারণত: ২৫–৩০ টাকা থেকে ৫০ টাকা পর্যন্ত পাই, তোমরা ২০ টাকা দাও, আমি সময় করে ভালভাবে নতুন কবিতা লিখে পাঠাই।' লেখার জন্য সময় ও সাধনা দরকার, গদ্যের চেয়ে কবিতার বেশি। ২রা নভেম্বর ১৯৫১ তে তিনি এই চিঠিটি লেখেন।

জলপাইগুড়ির মতো মফঃস্বল শহরের ছবি জীবনানন্দের মনের একটা বড় অংশ জুড়ে ছিল, যেমন পূর্ববাংলার প্রকৃতি ছিল তাঁর চেতনার গভীরে শেকড়ে গেড়ে। এর বীজ শৈশবেই রোপণ করা হয়েছিল। ভাই অশোকানন্দের ভাষায়: প্রকৃতির সৌন্দর্যে মগ্নচিত্ত সেই কিশোর আপনার পরিবেশকে বর্ণে, সুগন্ধে অপরূপ করে তুলবার সাধনায় ব্রতী হয়েছিলেন। স্কুলের উঁচু ক্লাসে পড়ার সময় কলকাতার এক নার্সারি থেকে ফুলের চারা আনিয়েছিলেন, নিজের পড়ার ঘরের ঠিক সামনে কিছুটা জমি ঘিরে ফুলের বাগান তৈরি করেছিলেন। যুঁই, চাঁপা, গন্ধরাজ, চামেলি, কাঁঠালচাঁপা, নীলজবা, হাস্নুহানা আর আশ্চর্য সুন্দর সব গোলাপ তা ছাড়া, কৃষ্ণচূড়ার নার্সারির ক্যাটালগে নাম ছিল পনসিয়ানা রিজিয়া।...পনসিয়ানা রিজিয়া গাছ বড় হয়ে গ্রীষ্মকালে অজস্র রক্তিম পুষ্পকে ভরে যেত, মনে হত যেন লাল আগুন জ্বলছে। এই গাছটি দাদার অতি প্রিয় ছিল। অনেক সময় চেয়ার পেতে এই গাছ তলায় বসে তিনি লিখতেন। পরবর্তীতে নাগরিক যন্ত্রণাক্লিষ্ট কবি মন বারে বারে আকুতি করেছে ওই গাছতলার ছায়ায় বসতে। 'আমার কামনা কি জানো? বইচি, ময়নাকাটা, বাবলা, ফণীমনসা, বন–অপরাজিতার পাশ দিয়ে এক একটা সাদা ধুলোমাখা ভারী শুদ্ধ আঁকাবাঁকা গ্রামের পথ থাকে, তারই পাশে এক একটা প্রান্তরের অপরিসীম নিঃশ্বাসের বিস্তারের সবুজ ঘাস আছে সেখানে। তাদের ভেতর শস্যপোকা আছে, দিয়ালি পোকা আছে, গঙ্গা ফড়িং আছে, কাঁচ পোকা আছে, সুদর্শন উড়িয়া আসে। হলুদ, কমলা, জর্দানীল রঙের প্রজাপতি কাশফুলের ভেতর সমস্ত দুপুর ঘুরিয়া ঘুরিয়া বেড়ায়, কোথাও হয়ত কতগুলো পলাশ, অর্জুন গাছ, উলু জঙ্গল, মাছ রাঙার ডাঙার শিরশিরানি, এমনই এক জায়গায়, ঘাসের নরম গাছের কাছে, প্রান্তরের একটেরে বনের

দেখা অশ্বাদ যেখানে অনেকদিন হইতে ছায়া রচনা করিয়া বাঁচিয়া আছেন। রাত্রিদিন শালিক, বুলবুলি, কোকিল ও কাককে আশ্রয় দিতে আসিতেন, সেই খানে খড়ের একখানা ঘর তুলিয়া পড়ি, লিখি চুরুট ফুঁকি কাটাইয়া দিই—' (সজ্ঞা: নিঃসজ্ঞা –৪২৪ পৃষ্ঠা)

প্রাসঙ্গিক কবিতা:

কোনো দিন রূপহীন প্রবাসের পথে
বাংলার মুখ তুলে খাঁচার ভিতরে নষ্ট শুকের মতন
কাটাইনি দিন মাস, লহনা খুল্লনার মধুর জগতে
তাদের পায়ের ধুলোমাখা পথে যে আমি যে বিকায়ে দিয়েছি মন
বাঙালী নারীর কাছে–চাল ধোয়া স্নিগ্ধ হাত, ধানমাখা চুল,
হাতের শাড়িটির কস্তা পাড়, ডাঁশা আম, কামরাঙা কুল।

জীবনানন্দের বেশিরভাগ কবিতা, পরবর্তীতে প্রকাশিত গদ্যসমূহে, ভীষণভাবে উপস্থিত নিসর্গ। এ বিষয়ে বুদ্ধদেব বসুর বহু–চর্চিত উক্তি: 'তাঁর সমস্ত কবিতাই কোনো না কোনো অর্থে প্রকৃতির কবিতা।' নিসর্গ এবং প্রকৃতিরও রকমফের আছে। তাঁর কবিতা আলোচনা প্রসঙ্গে উল্লেখসহ পবিত্র সরকার লিকেছেন: তাঁর নগর–নিসর্গের সঙ্গে যুক্ত হয়ে যায় যুদ্ধ বিধ্বস্ত নষ্ট ও দরিদ্র সময়, ফলে এ নিসর্গ তাঁর অনুভবে স্বস্তি বা উজ্জীবন নিয়ে আসে না। জীবনানন্দকে পরিভ্রমণ করতেই হয়, ওই নাগরিকতার বাইরে ওই সময়ের অতিক্রান্তির ওপারে কোনো অনন্ত অতীত ভবিষ্যতে, তাঁর ভূগোল ও ইতিহাস মিলিতভাবে পরস্পরকে আকীর্ণ বিস্তারিত করে তবেই তাঁর নিজস্ব নিসর্গকে আবিষ্কার করে।'

জীবনানন্দের 'রূপসী বাংলা' এক অন্য জগতের নির্মাণ। সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতে 'এক দীর্ঘ স্বগতোক্তি'।

এই মাঠে– এই ঘাস–ফল্‌সা এ ক্ষীরুয়ে যে গন্ধ লেগে আছে
আজো তার; যখন তুলিতে যাই ঢেঁকিশাক–দুপুরের রোদে
সর্ষের ক্ষেতের দিকে চেয়ে থাকি–অঘ্রানে যে ধান ঝরিয়াছে,
তাহার দু'এক গুচ্ছ তুলে নিই, চেয়ে দেখি নির্জন আমোদে
পৃথিবীর রাঙা রোদ চড়িতেছে আকাঙ্ক্ষার চিনিচাঁপা গাছে—
জানি সে আমার কাছে আছে আজো...
নিসর্গের নিছক অনুপঞ্জ বর্ণনা নয়, সময়গ্রন্থি জড়িয়ে এখানে।
যেমন: পল্লবের স্নতুপ, জাম–বট–কাঁঠালের হিজলের–অশথের করে আছে চুপ
বাংলার নদী মাঠ ভাঁটফুল ঘুঙুরের মতো তার কেঁদেছিল পায়
বাংলার শ্রাবণের বিস্মিত আকাশ চেয়ে রবে
এমন বিজন ঘাস–প্রান্তরের পারে
নরম বিমর্ষ চোখে চেয়ে আছে
রৌদ্র যেন ভিজে বেদনায়
গন্ধ জেগে আছে, আহা, কেঁদে ভাসিতেছে আকাশের তলে।

এভাবেই বারংবার জীবনানন্দ 'সব কিছুর মধ্যে নিজের ভালোবাসা বেদনা মৃত্যুবোধ স্থাপন করে এক গভীর আত্মগত নিসর্গ তৈরি করে' নিয়েছেন।

আমি সব দেবতারে ছেড়ে,
আমার প্রাণের কাছে চ'লে আসি,
বলি আমি এই হৃদয়েরে;
সে কেন জলের মতো ঘুরে ঘুরে একা কথা কয়।
(বোধ)

অথবা,

আমারো ইচ্ছা করে এই ঘাসের ঘ্রাণ হরিৎ মদের মতো
গেলাসে গেলাসে পান করি
এই ঘাসের শরীর ছানি–চোখে চোখ ঘষি,
ঘাসের পাখনায় আমার পলক
ঘাসের ভিতরে ঘাস হয়ে জন্মাই কেনো এক নিবিড় ঘাস–মাতার
শরীরের সুস্বাদ অন্ধকার থেকে নেমে
(ঘাস)

জীবনানন্দের প্রকৃতিলালিত কবিমনকে উত্তপ্ত সমকাল প্ররোচিত করেছিল ভিন্ন ধরনের নির্মাণে। সময়কালের নিবিড় অনুভব প্রজ্ঞা থেকে কবি বোঝার চেষ্টা করেছেন চারপাশের মানুষকে, সভ্যতা, জীবন, জগৎ সময়কে। সালাউদ্দিন আইয়ুবের ভাষায় 'তিনি দেখেছিলেন পৃথিবীর মানুষীর রূপ স্থূল হাতে ব্যবহৃত হয়ে হয়ে কীভাবে শুয়োরের মাংস হয়ে যায়, অন্ধকার সমস্ত অট্টহাসির ভিতর একটি বিরাট তিমির মৃতদেহ নিয়ে কীভাবে স্ফীত হয়ে ওঠে, কীভাবে উর্বশীর ডাইনীর মাংসের মতন বাদুড়ের খাদ্য হয়ে যায়; উন্নত পৃথিবীর একপিঠে তিনি দেখেছেন স্পন্দন, সংঘর্ষ, গতি উদ্যম, চিন্তার কাজ; অন্যপিঠে শত শত শুকরের চিৎকার, শত শত শুকরীর প্রসববেদনার আড়ম্বরের মতো

ভয়াবহ আরতি। মুমূর্ষু পৃথিবীর সূর্যাস্তকে তাঁর মনে হয়েছিল বেহেড আত্মার মতো। 'মূর্খ' ও 'রূপসীর ভয়াবহ সঙ্গম' এই রকম একটি বাক্যে বর্তমান সভ্যতার একটি মৌলিক অন্তর্বিরোধ তিনি তুলে ধরতে চেয়েছিলেন।–তাঁর আশঙ্কা থেকেছিল—

কবি তুমি ক্রমে ক্রমে হিম হয়ে পড়িতেছ বলে
সুন্দর যেতেছে মরে ধীরে ধীরে/ শান্তি আর থাকিবে না।

অথবা *বেলা অবেলা কালবেলায়*: নিসর্গের কাছ থেকে স্বচ্ছ জল পেয়ে/ তবু নদী মানুষের/ মূঢ় রক্তে ভরে যায়; সন্দিগ্ধ হয়ে প্রশ্ন করে, নদী/ নির্ঝরের থেকে নেমে এসেছো কি? মানুষের হৃদয়ের থেকে?' তিনি তাই দেখের অধিকাংশ সৃষ্টিই তাঁর ব্যক্তিগত জীবনের রসদ সমৃদ্ধ, নিজস্ব যন্ত্রণার জটিল জীবনের আলো আঁধারিকে আশ্রয় করেই ভাবনাগুলি প্রকাশ পায়। ফলে তার মননে থাকে আত্মগত উচ্চারণ। নিছক আত্মগত উচ্চারণেই থেকে থাকা নয়, তাঁর কথাসাহিত্যের অধিকাংশকেই আত্মজৈবনিক বলেও মনে হয়। ইতোপূর্বে আমাদের আলোচনায় জীবনানন্দের একটি চিঠির উল্লেখ করা হয়েছে। অন্য চিঠিতে ১৯৫৭–র জৈষ্ঠ্য মাসে কবি লেখেন 'বেশ ঠকে পড়েছি, সে জন্য বিরক্ত করতে হল আপনাকে। এখুনি চার পাঁচশ টাকার দরকার, দয়া করে ব্যবস্থা করুন। এই সঙ্গে পাঁচটি কবিতা পাঠাচ্ছি। পরে প্রবন্ধ ইত্যাদি (এখন কিছু লেখা নেই) পাঠাব। আমার একটা উপন্যাস (আমার নিজের নামে নয়–ছদ্মনামে) পূর্বাশায়, কিন্তু টাকা এক্ষুণি চাই—আমাদের মতো দু'চারজন বিপদগ্রস্ত সাহিত্যিকের এরকম দাবী গ্রাহ্য করবার মতো বিচার বিবেচনা অনেকদিন থেকে আপনারা দেখিয়ে আসছেন— সেজন্য গভীর ধন্যবাদ। লেখা দিয়ে আপনার সব টাকা শোধ করে দেব, না হয় ক্যাশে। ক্যাশে শোধ করতে গেলে ছ'সাত মাস তার বেশী নয়, দেরী হতে পারে।' একসময় তিনি, এই অবস্থায় পড়বার অনেক আগে অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তকে লিখেছিলেন 'চারদিকে বে–দরদীর ভিড়। আমরা যে কটি সমানধর্মা আছি, একটা নিরেট অচ্ছেদ্য মিলন–সূত্র দিয়ে আমাদের গ্রথিত করে রাখতে চাই। আমাদের তেমন পয়সাকড়ি নেই বলে জীবনে `Creative comforts' জিনিষটা হয়তো চিরদিনই আমাদের এড়িয়ে যাবে।"

বিভিন্ন জায়গায় কাজের জন্য ঘুরেছেন, বছরের পর বছর অনিশ্চিত জীবনযাপন করতে হয়েছে তাঁকে। খবরের কাগজের দপ্তরে কাজও করেছেন। 'স্বরাজ'–এ প্রায় বেতনহীন অবস্থায় কয়েক মাস কাজ করেন, রবিবারের সাময়িকী দেখতেন। এই কাগজের চাকরি ছাড়ার পরই তীব্র আর্থিক দুরবস্থায় পড়ে বাধ্য হন উপন্যাস লিখতে, রোজগারের জন্য, স্বাভাবিক ভাবেই অনেকাংশে তা তাই হয়ে উঠেছে আত্মজৈবনিক। নিজস্ব যন্ত্রণা জটিল জীবনের আলো–আঁধার অনুসৃত সৃজনের পেছনে থাকে তাঁর আত্মগত উচ্চারণ। যে ভালো লাগার আবেশ তাঁকে জলপাইগুড়ির প্রতি আকৃষ্ট করেছিল তার অনুরণন তাই আমরা তাঁর বিভিন্ন লেখাতে ছড়িয়ে থাকতে দেখি।

জলার্ক, খুব বেশিদিন প্রকাশিত হয় নি। এর মাঝে অন্তত ১০টি চিঠি সুরজিৎ দাশগুপ্তকে লেখেন জীবনানন্দ। একসময় বাংলার 'প্রগতিপন্থী' কবিদের দ্বারা নিন্দিত হয়েছিলেন সমকালীন পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত আলোচনার। *সীমান্ত*র প্রথম সংখ্যাতেই (১৭৫৯ চৈত্র) মণীন্দ্র রায় "প্রগতিশীল বাংলা কবিতার ঐতিহ্য ও দায়িত্ব" শীর্ষক প্রবন্ধে জীবনানন্দ বিষয়ে অত্যন্ত বিরূপ মন্তব্য করেছিলেন। একই সংখ্যাতে সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়ও 'জীবনানন্দ দাশ প্রসঙ্গ' তাঁর কবিতার জগৎকে আক্রমণ করেছিলেন। সুরজিৎ দাশগুপ্ত এই *সীমান্ত*–পত্রিকার সমালোচনার কথা উল্লেখ করে জীবনানন্দকে চিঠি দিয়ে তাঁর মতামত ও অবস্থান জানতে চান, জবাবে জীবনানন্দ লেখেন: 'আমার কবিতা সম্বন্ধে চারিদিকে এত অন্ধ ধারণা যে আমি নিজে এ বিষয়ে একটা বড় প্রবন্ধ লিখব ভাবছিলাম। কিন্তু শরীর বড় অসুস্থ, কোনো কাজই করতে পারছি না।" সুরজিৎ বাবু এই উত্তর পেয়ে নিজেই *সীমান্ত*–এ জীবনানন্দের বিরূপ সমালোচনার বিরুদ্ধে লিখতে চান এবং তার জবাবই প্রবন্ধকার চিঠির খসড়া করে কবিকে পাঠিয়ে মতামত জানতে চান। এ সময় জীবনানন্দ সুরজিৎ দাশগুপ্তকে উত্তর পাঠান। "কিন্তু কী আর হবে ওসব প্রবন্ধের প্রতিবাদ করে। আমার কবিতা সম্বন্ধে নানা জায়গায় নানারকম লেখা দেখেছি, মন্তব্য শুনেছি, প্রায় চৌদ্দয়ানি আমার কাছে অসার বলে মনে হয়েছে, কিন্তু এনিয়ে বিতর্কে নেমে বিশেষ কোনো ফল হবে না। আমাদের দেশে বড় সমালোচক আজকাল নে–ই এক রকম। আমার মনে হয় প্রত্যেক সৎ কবিই তার নিজের কাব্যের সবচেয়ে নির্ভয়যোগ্য সমালোচক; সেই হিসেবে নিজের কাব্য বিশ্লেষণ করে এদের প্রত্যেকেরই দীর্ঘ প্রবন্ধ লেখা দরকার।"

জলার্ক–এ প্রকাশিত কবিতাটি নিয়ে যখন সিগনেট থেকে *বনলতা সেন* প্রকাশিত হয় তখনও জীবনানন্দ জলপাইগুড়ির ঐ তরুণকে জিজ্ঞাসা করেন "এই বইয়ে প্রচ্ছদটা কেমন হয়েছে বলত? আমার কিন্তু একেবারেই ভাল লাগে নি। আমি কি রাজকুমারী অমৃতকুমারীকে ভেবে এই সব কবিতা লিখেছিলাম নাকি।" শুধু তা নয়, সুরজিৎ বাবু যখন কবির একটি চটি কবিতা গ্রন্থ প্রকাশের প্রস্তুতি নিচ্ছেন তখন লেখেন (৬/১০/৫২) "তুমি আমার একটা চটি কবিতার বই ছাপাতে চাচ্ছ কিন্তু আমি ভেবে দেখলাম যে এখন ও ধরনের বই ছাপিয়ে কোনো লাভ নেই। ও কাজে তুমি এখন আর হাত দিও না। আবার *বনলতা সেন* দেখে আমি অত্যন্ত হতাশ হয়েছি। এমন খারাপ

প্রচ্ছদপট আমি জীবনে দেখি নি। Signet Press-এর হাতেও বইয়ের এই দশা। এরপরে কবিতার বই বার করলে আমি নিজে আগাগোড়া সব দেখে শুনে ঠিক করব।" উল্লেখ করা যেতে পারে যে এই প্রচ্ছদপটটি এঁকেছিলেন সত্যজিৎ রায়, আমরা এ ক্ষেত্রেও জীবনানন্দের চরিত্রের এক দুর্লভ রহস্যময়তা দেখি। তিনি 'সিগনেট' থেকে *বনলতা সেন* প্রকাশের পরই কিন্নতু প্রকাশককে (দিলীপ কুমার গুপ্ত) চিঠি দিয়েছিলেন: *বনলতা সেন* বইটি পেয়ে খুবই আনন্দিত হয়েছি। খুবই চমৎকার বই হয়েছে। আপনাকে অশেষ ধন্যবাদ। বাংলা সাহিত্য, বিশেষ করে কাব্য সাহিত্যের জন্য সিগনেট প্রেস শ্রেষ্ঠ অগ্রণীর কাজ করেছে। এ কাজ নিখুঁত আন্তরিক; সত্যকে নতুন গৌরব ও চরিতার্থতা এনে দিল।" উল্লেখ্য চটি বইটি, যেটি প্রকাশের জন্য সুরজিৎ দাশগুপ্ত উদ্যোগী হয়েছিলেন, সেই প্রসঙ্গেও জীবনানন্দ লিখেছিলেন "তুমি আমার যে-সব কবিতার কথা লিখেছ সেগুলি প্রায় সবই *বনলতা সেন* ও *মহাপৃথিবী*-তে যাবে। "শিরীষের ডালপালা", 'তুমি' ও এবারকার 'কবিতা'-র থেকে দুটো কবিতা (আমার চটি বইয়ের জন্য যেতে পারে, আরো কয়েকটি কবিতা আমি পাঠিয়ে দিতে পারি—ষোলো পৃষ্ঠার বইয়ের জন্য দাম কত হবে বারোআনা? ছাপা কেমন হবে? তুমি লিখেছ ৫০% কিংবা ৭০% আমাকে দেবে? বইগুলোর বিক্রয়লব্ধ টাকার? ২৫০ কপি ছাপাতে তোমার কত খরচ পড়বে? কপি পাওয়ার পর কত দিনের মধ্যে বই বের করতে পার? আমাকে পরিষ্কারভাবে সব জানালে আমি কবিতা পাঠিয়ে দিতে পারি।"

এ সময় সুরজিৎ বাবুকে চিঠিতে কবি তাঁর ব্যক্তিগত অনেক প্রসঙ্গ এবং তাঁর বিব্রত অবস্থার কথা জানাতেন। এর ফলে তাঁর সঙ্গে এই শহরের কবিতাপ্রেমী গোষ্ঠীর সম্পাদকের হৃদ্যতার আভাসও পাওয়া যায়। এর প্রভাব ব্যাপ্ত ছিল জলপাইহাটি পর্যন্ত।

জীবনানন্দের মৃত্যুর অনেক পরে প্রকাশিত উপন্যাস *জলপাইহাটি* তাঁর বৃহত্তম গ্রন্থ। পূর্ববঙ্গের এক কল্পিত জনপদ জলপাইহাটি এই নামের সঙ্গে *জলপাইহাটি*র মিল থাকলেও সম্ভবত উপন্যাসটি জীবনানন্দ জলপাইগুড়ির সঙ্গে প্রত্যক্ষ নিবিড় সম্পর্কে আসার আগেই লেখা শুরু করেন। কারণ উপন্যাসের পাণ্ডুলিপির প্রথম পাতায় জীবনানন্দের নিজের দেওয়া তারিখ ৮/৪/৪৪ শেষ পাতায় ৯/৪/৪৮। পূর্ব পাকিস্তান ছেড়ে আসার পর কলকাতার ১৮৩, ল্যান্সডাউন রোডের বাড়িতে বসেই লেখা। তবে 'জলপাইহাটি' জলপাইগুড়ি না হলেও যে মফঃস্বলের ছবি জীবনানন্দের অন্তরের গভীর থেকে গভীরতর উৎসে ছিল, তার ভাবনাগত প্রতিক্রিয়া দেখলে তা অনুভব করা যায়: কলকাতার চেয়ে মফঃস্বলের প্রকৃতি, লোকেদের ভাল লাগে তাঁর। সেই সব মানুষদেরও ভাল লাগে "মফঃস্বলের গ্রামপ্রান্তর থেকে উপচে পড়ে যে সব মানুষ কার্তিকের বিকেলের রোদে, চোতবোশেখের শেষ রাতের ফটিক জলের মত জ্যোৎস্নায়। এসব মানুষ সব ঋতুতে সবসময়ই ভালো।" অথবা "কি অপরাধ হত জলপাইহাটিতে ছোট আশা, সাদামাটা কাজ, খাঁটি শান্তি, বৃহৎ মমতার ভেতরে পড়ে থেকে একদিন পৃথিবী থেকে অণুর মত রেণুর মত একটু খানি আশা মুছে ফেলে সময়ের নিরবচ্ছিন্ন গতি অগতি সাগরের অচেতনায় হারিয়ে গেলে?" দেশবিভাগজনিত বিষাদ, ব্যক্তি মানুষের নিঃসঙ্গ তা বিপন্নতাকে ভিত্তি করে লেখা এই উপন্যাসটি সম্পর্কে কথাকার অমর মিত্র লিখেছেন: 'তিনি ১৯৪৮-এর খণ্ডিত বাংলা, স্বাধীন ভারতবর্ষ, কলকাতা শহর নিয়ে পৃথিবীর কথা বলতে চাইছেন তো বলার জন্য, ওইসব যুক্তির ধার ধারেন নি। যুক্তি হয়তো কাহিনীকে শক্ত ভিতের ওপরে দাঁড় করায়, আবার আপাত যুক্তিহীনতা যে পরে যুক্তির সমগ্রতা হয়ে দাঁড়ায় তা *জলপাইহাটি* পড়তে পড়তে টের পাওয়া যায়। তাঁর অর্থাৎ কবি জীবনানন্দ দাশ-এর বলার মতো এমন কিছু কথা ছিল যা কবিতায় এঁটে উঠতে পারছিলেন না। সুতরাং উপন্যাসে যাওয়া। ১৯৪৮-এর ৮ই এপ্রিল থেকে ওই সালের ৯ই মে—একমাসে ৫১৭ পাতায় লিখে ফেলেছিলেন এই উপন্যাস। হিসেবে প্রায় একলক্ষ তিরিশ হাজারের মতো শব্দ। কীভাবে সম্ভব হয়েছিল ভাবতে গিয়ে থৈ পাই না। কখনো সন্দেহ জাগে সন তারিখ নিয়ে। কখনো মনে হতে থাকে, এ যেন গভীর এক নিস্তব্ধতায় ডুবে গিয়ে লেখা, এমন এক তাড়না ছিল তাঁর ভিতরে যে না লিখে পেরে উঠেন নি। উপন্যাস লিখব বলে যেন লেখেন নি *জলপাইহাটি*, এ যেন জ্যোৎস্না তাড়িত হয়ে লেখা—'।

একসময় যে কবি বুঝেছিলেন "এ যুগ অনেক লেখকের, একজনের নয়—কয়েকজন কবির যুগ", বিংশশতাব্দীর সূচনা পর্বের স্বপ্নপর্বের দেখা জগৎ স্বপ্ন দেখানো জগৎ, ক্রমশ শতাব্দীর বয়স হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে পাল্টাচ্ছিল, প্রকৃতির রূপ রস-এ নিমজ্জিত কবিও এই যন্ত্রণার বিবর্তন টের পেয়েছেন। যুদ্ধ মন্বন্তর, দাঙ্গা, কালোবাজারী, বেকারত্ব সমাজ ও রাষ্ট্রকে অস্থির করে তুলেছিল পরাধীনতার বেদনা ও স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা এই সময়ের সর্বোচ্চ আলোড়ন। "শতাব্দীর এই রাক্ষসী খেলায় আর বাস্তবের রক্ততটে জীবনানন্দের আগমন।" যার কাছে বাংলার লক্ষ গ্রাম "নিরাশায় আলোকহীনতায় ডুবে নিস্তব্ধ নিস্তেজ।" তাঁর যন্ত্রণার অভিব্যক্তি—

> কোনদিন মানুষ ছিলাম না আমি,
> হে নর, হে নারী,
> তোমাদের পৃথিবীকে চিনিনি কোনদিন;
> ...
> গভীর অন্ধকারের ঘুমের আস্বাদে আমার আত্মা লালিত;

আমাকে কেন জাগাতে চাও?"

জীবনানন্দ যেন যন্ত্রণার তাড়নায় ক্রমশ অস্থির হয়ে ওঠেন। একি শুধু বাইরের জগতের, তাঁর অভ্যন্তরের খবর কে রাখে তখন? তাঁর ব্যক্তিগত জ্বলন–দহনের? যার প্রতিফলন চিহ্নিত পত্রগুলো, শেষের লেখাগুলো। এখানেই *জলপাইহাটি*র চিত্রণ, 'জলপাইগুড়ি'র মত শান্ত নির্জন ভূখণ্ডে পৌঁছাতে না–পারার যন্ত্রণা একাকার।

সমালোচক ও কবি বন্ধুরা প্রকৃতি ও নির্জতার কবি পরিচয়ে আবদ্ধ করলেও তাঁকে অন্নদাশঙ্কর রায় 'শুদ্ধতম কবি' আখ্যা দিয়েছিলেন। ১৮ই নভেম্বর ১৯৫৪ তে অন্নদাশঙ্কর সুরজিৎ দাশগুপ্তকে শান্তিনিকেতন থেকে চিঠি লিখেছিলেন এ নিয়ে: আমি জীবনানন্দকে শুদ্ধতম কবি বলেছিলাম এ কথা কি তুমি জীবনানন্দকে জানিয়েছিলে? যদি জানিয়ে থাকো তবে খুব ভালো কাজ করেছ। তাঁর মৃত্যুর পর যে উচ্ছ্বাস সর্বত্র দেখা যাচ্ছে এর একাংশ যদি তিনি দেখে যেতে পারতেন। এমনি হয়ে থাকে। Rilke–কে তাঁর জীবনকালে কজন প্রশংসা করত? Kafka–কে কজন চিনত? কেন Keats–এর বেলা কি হয়েছিল? আমি মনে করি সমসাময়িকদের কাছে তারিফ পেলে কবিরা বখে যায়, Spoilt হয়, কবি–এখানে যে কোনো সাহিত্যিক। আমিও। দু'চারটি অনুরাগী পাঠক থাকলেও যথেষ্ট। এও যদি না জোটে তা হলে কবির জীবন সত্যি খুব দুঃখের...।"

১৯৫১–র জুন–এ সুরজিৎ বাবুকে এক ব্যক্তিগত আলাপাচারিতায় অন্নদাশঙ্কর জীবনানন্দকে 'শুদ্ধতম কবি' অভিধায় আখ্যায়িত করেছিলেন। এই 'শুদ্ধতম কবি'–র সঙ্গে জলাপাইগুড়ির তরুণ কবিতাপ্রেমীদের হৃদ্যতার কথাও জানতেন অন্নদাশঙ্কর, তবে জলপাইগুড়ির সঙ্গে জীবনানন্দের এই নিবিড় সম্পর্ক পত্রালাপের সেতুতেই জুড়ে ছিল, ঐ সেতু পেরিয়ে "ঝিল, হাঁস ও শিরীষ গাছের ছায়ায়" তার আসা হয়ে উঠে নি। অনেক অপূর্ণ ইচ্ছেদের সঙ্গে এই ইচ্ছেটিও বুকে পুষে রেখেছিলেন, যে বুকের গভীরে তীব্র যন্ত্রণার হলাহল। আশা স্বপ্নে ছাইভস্ম।

সূত্র

এই সময় ও জীবনানন্দ, সম্পাদনা : শঙ্খ ঘোষ। সাহিত্য আকাদেমি।
জীবনানন্দ দাস: বিকাশ প্রতিষ্ঠার ইতিবৃত্ত : দেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়
জীবনানন্দ দাস: প্রভাতকুমার দাস
করতলে মহাদেশ : আবদুল মান্নান সৈয়দ
জীবনানন্দ দাশ: ঘুম ও জাগরণ, জহর সেন মজুমদার
জার্নাল : শঙ্খ ঘোষ
বাংলার কাব্যে দুরূহতা ও সুররিয়ালিজম : শুদ্ধসত্ত্ব বসু
আধুনিক কবিতার ভূমিকা : সঞ্জয় ভট্টাচার্য
দ্বিতীয় ভুবন : সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী
চরিত্র ৩য় সংস্করণ: সাক্ষাৎকার, অশোকানন্দ দাশ
কবি জীবনানন্দ: বিনির্মাণের প্রস্তুতিপট
জীবনানন্দ: সম্পাদনা: পার্থজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়। সাহিত্যলোক
বিভাব (জীবনানন্দ সংখ্যা) কোরক, অমৃতলোক, অনুষ্টুপ–এর জীবনানন্দ সংখ্যা এবং সাক্ষাতে, অসাক্ষাতে সুরজিৎ দাশগুপ্ত।

বিনয় মজুমদারের স্কেচ এখানে

সুস্থ মৃত্তিকার চেয়ে সমুদ্রেরা কত বেশী বিপদ সংকুল
আর বেশী বিপদের নীলিমায় প্রক্ষালিত বিভিন্ন আকাশ
এ সত্য জেনে তবু আমরা তো সাগরে আকাশে
সঞ্চারিত হতে চাই, চিরকাল হতে অভিলাষী,
সকলপ্রকার জ্বরে মাথা ধোয়া আমাদের ভালো লাগে বলে।

এই দৃষ্টিগম্য আকাশের পরে অধিক নীলাভ সেই প্রকৃত আকাশ

১১ ডিসেম্বর ২০০৬ সকালে পাঠানো মোবাইল বার্তা, বিনয় মজুমদার আর নেই। না চমকে উঠি নি এই খবরে, এমন একটা খবর শোনার প্রস্তুতি ছিলই, কিন্তু তবুও এই খবরে একটা শূন্যতার ধাক্কা ছিল। বিনয় মজুমদারের মৃত্যু অভিমুখী যাত্রা শুরু হয়েছিল অনেকদিন আগেই, আমরা ক্রমশ সেই পরিণতির দিন গুনছিলাম মাত্র। একজন কবি, গোটা জীবন যাঁর ছিল অগ্নিপথ যাত্রা, একজন কবি যিনি হতে পারতেন অর্থের ও বৈভবের প্রাচুর্যে ভরপুর এক সফল মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার, গণিতজ্ঞ। একজন কবি, যিনি তিন তিন বার ছিন্নমূল হয়ে শেষে শিমুলপুরের নিঃসঙ্গ বাড়ির এক তক্তপোশে দৃষ্টিশূন্য, স্মৃতিশক্তিহীন হয়ে মৃত্যুর দিকে হেঁটে গেলেন উড়ে গেলেন তাঁর সারসের দিকে...।

বিনয় মজুমদার এক প্রবহমান ক্রিয়েটিভ এনার্জি, তাঁর চারপাশের খোলা বাজার থেকে সম্পূর্ণ আলাদা, একা। 'নিভৃতে মন্থনজাত একাকিত্ব তিনি এতটাই আলাদা যে বাস্তব সকাশে মানুষ তাঁর পাগলামি দেখতে পায়, অভ্যন্তরস্থ শূন্য প্রদেশের বোধতাড়িত নিঃশব্দ ঘূর্ণি অনুভব করতে পারে না।' বিনয়ের মতো কবিরা এরকম নিঃশব্দ অভ্যন্তরীণ ঘূর্ণি থেকেই সৃষ্টিশীল হয়ে ওঠেন।

আমি হতাশাবোধে, অব্বয়ে, ক্ষোভে ক্লান্ত হয়ে
মাটিতে শুয়েছি একা—কিটদষ্ট নষ্ট খোসা, শাস।
হে ধিক্কার, আর্তঘৃণা, দ্যাখো, কি মলিন বর্ণ ফল।
কিছুকাল আগে প্রাণে, ধাতুখণ্ডে সুনির্মল জ্যোৎস্না পড়েছিল

বিনয়ের মৃত্যুর পর অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত বিনয়ের স্থায়ীত্ব সম্পর্কে মন্তব্য করেছেন যে বিনয় মজুমদার চলে যাবার পরে অনপনেয় শূন্যতার শামিল হলেও এই মুহূর্তে বলতে পারছি না, সাহিত্যের সুযোগী ইতিহাস তাঁকে অদূরভবিষ্যতে কোন্ অবস্থান উপহার দেবে, যে জায়গাটাই নির্দিষ্ট করে দিক না কেন কিছুই এসে যায় না, কেননা কবিতার ব্রহ্মাস্বাদ পরিগ্রহণ করার দায় বর্তায় তো সংখ্যালঘু একটি এলিটের উপরেই, এবং সেই স্বল্পসংখ্যক নির্বাচকদের মধ্যে তাঁর চিরায়ত অবস্থিতি নির্ধারিত হয়ে গিয়েছে। "তিনি আজীবন সঠিকভাবে কবিজনোচিত মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হয়ে চলেছিলেন এবং সেই মর্মেই চালিয়ে গিয়েছিলেন 'নৈয়ায়িক' বাগ্‌বিতর্ক অনেক সময় নিজেরই সঙ্গে।"

১৯৮১–র শীত সকাল। প্রথম বিনয় মজুমদারের মুখোমুখি হওয়া। কিছুদিন আগেই সদ্য তরুণ আমাদের হাতে এসেছে *ফিরে এসো চাকা*, তার *অঘ্রানের অনুভূতিমালা* আর *বাল্মিকীর কবিতা*। থমকে গিয়েছিল কয়েকটি দিন, যেন 'বেদনার গাঢ়রসে অপক্ক রক্তিম হল ফল'। বাংলা কবিতার বয়ঃপ্রাপ্তি যাঁদের হাত ধরে, জীবনানন্দ উত্তরকালে সেই কবিদের প্রধানতম কবির উচ্চারণ স্তব্ধ হয়ে শুধু অনুভব করার সেই সময়। 'কবিতা' থেকে 'কবি' পর্যন্ত আসতে যে কয় মাস। তারপর কবির মুখোমুখি বসবার তাড়নায় এই ছুটে আসা, তিস্তাবজ্ঞা থেকে বন্‌গাঁ লাইনের ঠাকুরনগর।

শিয়ালদহ থেকে বনগাঁ লাইনের ট্রেন ধরে ঠাকুরনগর। স্টেশন থেকে নেমে রেললাইন ধরে কিছুটা হাঁটতেই ডানদিকে প্রাচীন নারকেলসহ নানা গাছগাছালির ঘেরা বিরাট এলাকা নিয়ে একতলা কয়েকঘরের বাড়ি। গাছের ছায়া নিবিড় বাড়িটা আপাতভাবে জনমানব শূন্য মনে হয়। কথা মতো স্টেশনেই অপেক্ষায় ছিল অমলেন্দু আর পঙ্কজ। পরপর

ঘরগুলো, সামনে বারান্দা, প্রথম ঘরটাতেই তিনি থাকেন, দরজাটা হা করে খোলা, কাঠের চৌকির উপর কালো হয়ে যাওয়া মশারিটা তখনও টাঙানো, একটা কোণ থেকে তুলে রাখা হয়েছে। সামনে একটা টেবিল ভর্তি চারমিনারের খাপ, আর কাগজপত্র পত্রপত্রিকা ছড়িয়ে ছিটিয়ে বিছানা আর ঘরময়। তিনি আওয়াজ শুনে মাথা তুলে তাকালেন, তিনি বিনয় মজুমদার, যিনি লিখতে পারেন:

শয়নভঙ্গীর মতো স্বাভাবিক সহজ জীবন
পেতে হলে ঘ্রাণ নাও, হৃদয়ের অন্তর্গত ঘ্রাণ।

যার সম্পর্কে অনুজ কবিরা বলেন: কবিতার শহীদ'। 'বাংলা কবিতার অমরদের একজন', 'কবিতার স্বয়ং ঈশ্বর'। 'একজন বৈজ্ঞানিক কবি', 'অব্বয়ী আধুনিকতাবাদের ট্রাজেডির মূর্ত প্রতীক।' 'নিবিড় মগ্ন কবি', 'এই বাংলা কবিতায়...এক অস্থির ভূপ্রকৃতরি অংশ', 'একটি সমাহিত আগ্নেয়গিরি'। 'আধুনিকতার এক অনন্য উত্তরসূরি', 'এই শতাব্দীর আধুনিক বাৎসায়ন', 'আমাদের কালের সবচেয়ে বড়ো অ্যাডভেঞ্চার। (উদ্ধৃতিগুলো: জ্যোতির্ময় দত্ত, অমিতাভ গুপ্ত, রণজিৎ দাশ, জহর সেন মজুমদার, ঋত্বিক ঘটক, উৎপলকুমার কসু, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, শক্তি চট্টোপাধ্যায়, অরুনেশ ঘোষ, সুজন রহমান–এর।)

ঔপনিবেশিক বর্মার মাটিতে জন্ম নেন বাংলা কবিতার চিরঅশান্ত, আক্রান্ত, নিঃসঙ্গ কবি বিনয় মজুমদার। জন্ম: ১৯৩৪–এর ১৭ই সেপ্টেম্বর, মৃত্যু ১০ই ডিসেম্বর ২০০৬, এভাবে লেখা হলে সরলীকরণ হবে। আসলে বিনয় মজুমদারকে বারবার মৃত্যুকে আলিঙ্গান করতে হয়েছে, মৃত্যুর সঙ্গে বসবাস যেন হয়ে উঠেছিল তাঁর প্যাশন। তাঁর প্রিয় মানুষদের মৃত্যু, তাঁর পেশা জীবনের মৃত্যু, তাঁর স্বাভাবিক সুস্থতার মৃত্যু, তবুও তাঁর একটি কবি জন্মের মৃত্যু থেকে আবার জন্ম নিয়েছিল আর একটি কবি জন্ম।

৩১শে মার্চ, ৯৩। কোলকাতা মেডিক্যাল কলেজের এজরা ওয়ার্ডের দৃষ্টিশক্তিহীন বিনয়, স্বজনেরা নিয়মিত তার সঙ্গে দেখা করে যাচ্ছেন। সে সময় কাগজে তার লেখা ছিন্ন–ছিন্ন পঙ্‌ক্তির কবিতা। অমলেন্দু বিশ্বাসরা যা এক পঙ্‌ক্তির কবিতা নামে ছেপে বের করেন। এ সময় তিনি গদ্যও লেখেন 'সাহিত্যের গতি গণিতে'। লিখেছিলেন 'গণিত ও কবিতা একই জিনিস'। লিখেছিলেন '...ছাব্বিশটা অক্ষরের ছাব্বিশটা সমীকরণ। এর ফলে অভিধানের সব শব্দই গণিত সমীকরণ হয়েছে, ফলে এই বিশ্বে সবকিছুই গণিত হয়ে গেছে'। মনে পড়ে, ১৯৫৯–এ মূল রুশ থেকে অনূদিত বই *মানুষ কি করে গুনতে শিখল* (বেরমান)–এর ভূমিকায় বিনয় এঙ্গোলস্–এর উদ্ধৃতি দিয়ে লিখেছিলেন, 'গণিত হচ্ছে বস্তুপুঞ্জে বাস্তব দেশগত এবং পরিমাণগত সম্বন্ধ, অর্থাৎ সর্বাপেক্ষা সারবস্তু'।

অঙ্কের জটিল সমীকরণই গোটা জীবন মেলাতে চেয়েছেন বিনয় কবিতার সমীকরণ দিয়ে। সমীকরণ পাল্টেছেন, জটিল থেকে ক্রমশ সরলতম উচ্চারণে এসেছেন, অঙ্কের নিয়মে। তিনি বলতেন: তোমার জীবন শুরু, তুমি বহুদিন থাকবে। এই ধর ষাট/সত্তর, হয়তো আরও বেশি। ধর ইনফিনিট এই ইনফিনিট সূত্র মাত্র। মানে একটা মানুষ ইনফিনিট বাঁচে না, এই সমীকরণও বটে। মানে অসীমতার সমীকরণ যখন ইনফিনিটের কথা উঠল, তখন গণিতের অসীমতা নিয়ে বলা যায়, সাহিত্য বা কবিতা সৃষ্টি করতে কি কেবল ডিগ্রি বা মানের প্রয়োজন হয়, না নির্ভর করতে হয়? কিন্তু সবকিছুর লক্ষ্য অসীম, অসীমতার দিকে পৌঁছানো'। বিনয় যে অসীমতার সন্ধানী ছিলেন, অজ্ঞ বিলাসী সমাজ তাকে বারংবার খণ্ডিত ও রুদ্ধ করতে চেয়েছে, তবুও তিনি এই সীমা বা গণ্ডিকে ভেঙেছেন, কবিতায়, জীবনে, এবং বাস্তবতায়ও। গণিত ও কবিতার মধ্যবর্তী এই মানুষটির প্রয়াণের পর সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজের অভিমত তাই প্রণিধানযোগ্য: 'শুধু গণিতবিদই বিশ্ববাস্তবতাকে ধরতে পারে না, বিনয় ধরতে পেরেই কি সাধারণ বাস্তবতার সীমা ডিঙিয়ে চলে গেল বিমূর্ত গাণিতিক রহস্যের কেন্দ্রে? ওর কবিতার আমি বরাবর মুগ্ধ পাঠক। ওর কবিতার অজস্র সংকেত আছে, যা অন্যরকম বোধ দিয়ে বোধগম্য হতে পারে বলে মনে হয়। সেমিটিক শাস্ত্রে জ্ঞানকে পাপ বলা হয়েছে কেন, সেটা যেন বিনয়ের জীবন এবং এর পরিণতি দেখলেই বোঝা যায়।'

বিনয় পরিণতির এই ছবি যে চিনতেন তা তাঁর *ফিরে এসো চাকার* নানা কবিতায় ছড়িয়ে আছে:

সুস্থ মৃত্তিকার চেয়ে সমুদ্রেরা কত বেশী বিপদ সংকুল
আর বেশী বিপদের নীলিমায় প্রক্ষালিত বিভিন্ন আকাশ
এ সত্য জেনে তবু আমরা তো সাগরে আকাশে
সঞ্চারিত হতে চাই, চিরকাল হতে অভিলাষী,
সকলপ্রকার জ্বরে মাথা ধোয়া আমাদের ভালো লাগে বলে।'
এই বিনয় সর্ব যুগের, চিরনতুন, চিরকালীন।

বিনয় *ঈশ্বরীকে* বা *ফিরে এসো চাকা*, *অঘ্রানের অনুভূতিমালা* আর *বাল্মিকীর কবিতার* মতো এক্কেবারে ভিন্নরকমের ও বৈশিষ্ট্যের সৃষ্টির মতো তাঁর জীবন বৈচিত্র্য ও ভিন্নতায় রঙিন এক আশ্চর্য অভিযাত্রীর ট্রাভেল। জন্মেছিলেন বার্মায়। বার্মার মান্দালয় রেলস্টেশনের কাছাকাছি টোডো শহরতলি। বাবাও ছিলেন সিভিল ইঞ্জিনিয়ার, চাকরির

সূত্রে বার্মা থাকতেন তিনি। তাঁদের আদিবাড়ি ছিল পূর্ববঙ্গের ফরিদপুরের এক গ্রামে, ১৯২০ নাগাদ বাবা বিপিনবিহারী মজুমদার বর্মায় চাকরি সূত্রে যান, মা বিনোদিনী মজুমদার যাঁর নামে ঠাকুরনগরের বিনোদিনী কুঠি। জীবনের প্রথম আট বছর কাটে এই টোডোতে। ১৯৪২–এ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের চূড়ান্ত পর্বে বিধ্বস্ত মান্দালয় থেকে আরো অনেক ভারতীয়ের সঙ্গে তাঁরাও পায়ে হেঁটে মাতৃভূমির উদ্দেশ্যে রওনা হতে বাধ্য হন। বিনয়ের তখন আট বছর বয়স। তাঁর ভাষায় 'দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় পায়ে হেঁটে নাগা পাহাড়ের উপর দিয়ে ভারতে ফিরতে হয়েছে—জাহাজে আসা যায় নি। ফ্যামিলি শুদ্ধ খুব কষ্ট। আড়াই মাস লেগেছিল হেঁটে আসতে।' কোহিমা হয়ে অসমের উপর দিয়ে তাঁরা এসে পৌঁছান তাঁদের আদিবাস ফরিদপুরে। ফরিদপুরে তাড়াইল গ্রামে তাঁরা ছিলেন ১৯৪৮ পর্যন্ত, আবার দেশভাগ, ছিন্নমূল হয়ে ভিটের সন্ধান।

এভাবেই তাঁদের চলে আসা এপারের ঠাকুরনগরে। ফরিদপুরে থাকার সময়ই বোলতলি উচ্চ ইংরেজি উচ্চ বিদ্যালয়ে ছাত্র হিসাবে তাঁর একটি লেখা ঐ স্কুলের ম্যাগাজিনে ছাপা হয়। বাবা শিমুলপুরের বাড়ি বানালেও বিনয় প্রথমে পড়াশোনার জন্য, পরবর্তীতে অন্যান্য কিছু কারণে কোলকাতাতেই থাকতেন। ছাত্রাবস্থায় মেসে থাকতেন, পড়তেন মেট্রোপলিটান ইনস্টিটিউশনে। ছাত্র হিসাবে বিনয় ছিলেন বিশেষভাবে নজরকাড়া। এখান থেকেই মেট্রিকুলেশন পাশ করেন তিনি। প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে আই.এস.সি পাশ করার পর ভর্তি হন বি.এ কলেজে।

> ...তবে জীবনের বাল্যকাল থেকে এ অবধি
> যেমন নিচের থেকে খালবিলে মাছ ধরা থেকে
> শুরু করে শেষাবধি যে রকম উন্নতি করেছি
> তার কথা মনে পড়ে দুপুরের অলস বেলায়।
> আমি এক কমিউনিস্ট—এই কথা উচ্চারিত হোক
> দিকে দিকে পৃথিবীতে—এ আমার সঙ্গত কামনা।'
> (কবিতার খসড়া/২৬)

স্কুল জীবনেই মার্কসবাদে আকৃষ্ট বিনয় প্রেসিডেন্সি কলেজে পড়ার সময় আরও তীব্রভাবে জড়িয়ে যান বামপন্থী ছাত্র আন্দোলনে। ১৯৯৫৫–৫৬–৫৭–শিবপুর বি.ই কলেজে এই মতাদর্শতাড়িত ছাত্রদের সংগঠিত করায় উদ্যোগী হন এবং তাঁদের প্রচেষ্টায় ছাত্র ইউনিয়ন স্বীকৃতি পায়। বিনয় হন তার প্রথম সভাপতি। সে বছর বি.ই কলেজের শতবর্ষ। লেনিনের লেখার প্রতি আকর্ষণ, গোর্কির সাহিত্যের প্রতি আকর্ষণে তিনি রুশ ভাষা শিখে নেন। অধ্যাপক মাদাম গুমেভের কাছে তাঁর রুশ ভাষা শেখা, চার বছর ধরে। ১৯৫৮ তে রুশ গ্রন্থ অনুবাদ করেন তিনি। মোট ছয়টি বই রুশ থেকে অনুবাদ করেন। ন্যাশনাল বুক এজেন্সিতেও যুক্ত ছিলেন বেশ কিছুদিন। দুবছরে পাঁচটি বই রুশ ভাষা থেকে অনুবাদ করেন, এগুলো এন.বি.এ থেকে প্রকাশিত হয়। রুশ ভাষা যে তাঁর আয়ত্তে ছিল তার প্রমাণ পরবর্তীতে অনুবাদকের চেহারায় দেখা যায় নি, তবে ১৯৮২তে ঠাকুরনগরে মার্কসবাদী কমিউনিস্ট পার্টির দেওয়া সংবর্ধনা সভায় মঞ্চে হাজির ছিলেন রুশ কনসাল, তাঁর সঙ্গে রুশ ভাষায় অনায়াসে কথাবার্তা চালিয়েছিলেন সংবর্ধিত বিনয়। মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের ছাত্র বিনয়ের বিষয় ছিল প্রোডাকশন ইঞ্জিনিয়ারিং। বিনয়ের সমসাময়িক শিবপুরের এক ছাত্র সমীর রক্ষিত, গদ্য সাহিত্যে যিনি আলাদা পরিচিতি তৈরি করেছেন, মার্কসবাদী রাজনীতিতে আস্থাশীল সমীরবাবু জলপাইগুড়ি থেকে কোলকাতা আসেন পড়াশোনার জন্য। ইঞ্জিনিয়ারিং পাস করার পর বিনয় মজুমদারের চাকরিজীবন। বিনয়ের নিজের ভাষায় 'তারপর কলেজ শিক্ষা শেষ করে আমি চাকরি পাই। অল ইন্ডিয়া ইনস্টিটিউট অফ হাইজিন এ্যান্ড হেলথ নামক প্রতিষ্ঠানে। অধ্যাপনার কাজ। তখন বিকেলের ছুটির পরে বাড়ি ফেরার পথে দৈনিক একবার কফি হাউসে গিয়ে হাজির হতাম। এবং বহু তৎকালীন তরুণ কবির সঙ্গে আলাপ হয়ে যায়।' এ সময় বিনয়ের সঙ্গে যাঁদের ঘনিষ্ঠতা হয় তাঁদের মধ্যে রয়েছেন মোহিত চট্টোপাধ্যায়, বিষ্ণু দে প্রমুখ। "এই সময় বিষ্ণু দের বাড়িতে যেতাম মাঝে মাঝে। নিজের কবিতার খাতা তাঁকে দিয়ে আসতাম। বিষ্ণু দে আমার তিন চারটি কবিতা তাঁর *সাহিত্য পত্র* নামক পত্রিকায় ছাপেন।" ১৯৫৮তেই ছাপা হয়েছিল তাঁর 'নক্ষত্রের আলোয়'। ১৯৫৯–এ চাকরি থেকে ইস্তফা দেন। "তারপর ১৯৬০ খ্রীষ্টাব্দে একেবারে প্রারম্ভে ভাবলাম সারা জীবন লিখব, অন্য কিছু করব না। "ইতিমধ্যে তাঁর *ফিরে এসো চাকার* কবিতাগুলো লেখা হয়ে গেছে। "১৯৫৯ খ্রীষ্টাব্দের গোড়ার দিকে আমি আমার বন্ধু মিহির ঘোষ দস্তিদারের পাইকপাড়াস্থ বাসভবনে অতিথি হয়ে মাস কয়েক ছিলাম। মিহিরের বাড়িতেই *ফিরে এসো চাকার* প্রথম কবিতাগুলো লিখি।" এখান থেকেই বলা যায় কবি বিনয়ের নূতন এক ভাষাজগত নির্মাণের সূচনা। রহস্যের, অঙ্কের, তর্কের উর্ধ্বে সে জগত, শক্তির ভাষায়, 'প্রকৃত অলৌকিক কবির' যাত্রা শুরু।

> আমি মুগ্ধ; উড়ে গেছ; ফিরে এসো, ফিরে এসো চাকা,
> রথ হয়ে, জয় হয়ে চিরন্তন কাব্য হয়ে এসো।'

বিনয়ের অসুস্থতার কথা সবাই জানেন। তাঁকে প্রথম দেখার পর গত ২৫ বছর বারংবার জেনেছি খবর পেয়েছি তাঁর অসুস্থতার; কিন্তু মানুষটার কাছে গেলে রোগযন্ত্রণার উর্ধ্বে এক প্রাজ্ঞ ঋষির যন্ত্রণাহরণ শক্তির দেখা মিলতো। তাঁর কবিতাও যেন অন্য এক

শক্তির সঞ্জীবনী মন্ত্র। তবুও এই মানুষটির কলেজ–জীবন উত্তর জীবনযাপন একটা মিথ। মিথের কেন্দ্র চরিত্র গায়ত্রী বা তাঁর ঈশ্বরী বা তার সৃষ্টি ও যন্ত্রণার সৃষ্টিমূল। এই গায়ত্রীকে নিয়ে অভিমত নানা কথা। অধিকাংশই একে অন্যকে খণ্ডন করে। তবুও বাংলা কবিতায় তিনি এমন এক চরিত্রকে দিয়েছেন যে শুধু কল্পনার নয়, শুধুমাত্র বাস্তবের নয়, কেবল রহস্যেরও নয়, এ যেন অন্য কিছু অন্য রকম...এ বনলতা সেন নয়, নীরা নয়, এ সুচেতনা নয়, অন্য রকম কেউ।

বিনয় ও গায়ত্রী, বিনয় ও তাঁর ঈশ্বরী, বিনয় ও তাঁর চাকার সম্পর্ক নিয়ে নানা কল্প ও কথা ছড়িয়ে আছে। এর কিছুতে রয়েছে বিনয়ের পরোক্ষ বা প্রত্যক্ষ মদদও, কিছু তাঁর আচ্ছন্ন সময়ের তরুণ গুণগ্রাহীদের অতি উৎসাহী পর্যবেক্ষণজাত। যাই হোক, বিনয়ের যন্ত্রণাকাতর পরিণতির দিকে ঠেলে দিয়েছে তাঁর মন ও মনের বাইরের নিকটজনের থেকে প্রাপ্ত নির্মম ধাক্কা, যা মানসিক দিক দিয়েও তাঁকে অর্ধেক জীবন বিপর্যয়ের মধ্যে কাটাতে বাধ্য করে। তবে বিনয় এই জন্যই তুলনারহিত যে এই সমস্ত আঘাত নিয়ে তিনি যন্ত্রণা বিলাসে লিপ্ত হননি বা আত্মপীড়নকে পণ্য করেন নি। তাই বিনয় লিখতে পারেন:

যখন কিছু না থাকে, কিছুই নিমেষ লভ্য না
তখনো কেবলমাত্র বিরহ সহজে পেতে পারি।
তাকেই সম্বল ক'রে, বুঝি এই মহাশূন্য শুধু
স্বতঃস্ফূর্ত। জ্যোৎস্নায় পরিপূর্ণ, মুগ্ধ হতে পারে।

আবার যন্ত্রণাকে আত্মস্থ করে লেখেন:

আমি রোগে মুগ্ধ হয়ে দৃশ্য দেখি, দেখি জানালায়
আকাশের লালা ঝরে বাতাসের আশ্রয়ে আশ্রয়ে।
আমি, মুগ্ধ; উড়ে গেছো, ফিরে এসো, ফিরে এসো চাকা।
এই চাকা, কি বা কে?

চাকা যে চক্রবর্তী থেকে আহৃত তা নিয়ে অনেকেই সহমত। তবে চক্রবর্তী কে? গায়ত্রী চক্রবর্তী? এ বিষয়ে বিনয়ের ভাষ্য:

'ফিরে এসো রথ হয়ে, চিরন্তন কাব্য হয়ে। অনেকে বলেন মহিলাকে নিয়ে লেখা—এটাও মিথ্যা নয়, বাজে কথা নয়। প্রথমে গায়ত্রীকে নিয়েই লেখা পুরো বই—৭৭টি কবিতা। ...যিনি আমার গুরুদেব ছিলেন বাংলা ভাষা পড়াতেন আমাকে, প্রেসিডেন্সি কলেজে সেই জনার্দন চক্রকর্তীর মেয়ে হল গায়ত্রী চক্রবর্তী। ইডেন হিন্দু হোস্টেলের সুপারিটেনডেন্টও ছিলেন। আমি ঐ হোস্টেলে থেকেছি দুই বছর। গায়ত্রীর বয়স তখন কত হবে? ১০–১১–১২ বছর, আমার তখন হবে ধরো ১৬–১৭–১৮ বছর। তখন আমি ওকে দেখেছি। এরপর তো হোস্টেলে থেকে চলে গেলাম। বি.ই (ইঞ্জিনিয়ারিং) পড়লাম। চাকরি করলাম। চাকরি করার পর বেকার বসে বসে কবিতা লিখলাম। তখন গায়ত্রী বি.এ পাশ করেছে। ফার্স্ট ক্লাস ফার্স্ট। ফের দেখলাম। তখন লিখলাম ৭৭টি কবিতা। *ফিরে এসো চাকার* কবিতাগুলি।...'

(মারুফ হোসেনের সঙ্গে কথোপকথন ১১ই সেপ্টেম্বর' ৯৯)

অন্যত্র বিনয় বলেছেন, "আমার সঙ্গে তিনচারদিনের আলাপ— প্রেসিডেন্সি কলেজের নামকরা সুন্দরী ছাত্রী ছিলেন ইংরেজি সাহিত্যের—তারপর কোথায় চলে গেলেন—আমেরিকা না কোথায় ঠিক জানি না।"

যাই হোক, এই গায়ত্রী বিনয়ের ছাত্রাবস্থায় একটা ধাক্কা দিয়েছিল। যা তাঁর অন্তর্জীবনের ঘটনা, দূর থেকেই দেখে তৈরি হওয়া অবসেশ্‌ন, কিন্তু অভিঘাত দীর্ঘস্থায়ী।

গর্ভস্থ ভ্রূণের প্রতি গূঢ় ভালোবাসার মতন
প্রকাশের কোনো রূপ উপায়হীন যন্ত্রণায়
গীতিপরায়ণ আমি; মানুষের মরণের আগে
পিপাসা পাওয়ার মতো অতিরিক্ত অথচ করুণ
আমার অপেক্ষা, আশা—আজ এরকম মনে হয়।

১৯৬৪ নাগাদ, বিনয় তখন মানসিক রোগের প্রকোপে ধীরে ধীরে আচ্ছন্ন হচ্ছেন। বাড়ি থেকে বিচ্ছিন্ন, মেসবাড়ির রাঁধুনের সঙ্গে মারামারির কারণে মেস থেকেও বিতাড়িত হয়ে আশ্রয় নিয়েছেন জ্যোতির্ময় দত্তের ব্রড স্ট্রিটের বাড়িতে। মীনাক্ষী দত্তের শুশ্রূষা ও চিকিৎসকের চিকিৎসায় কিছুটা সুস্থ। মীনাক্ষী দত্তের ভাষ্যে জানা যায় যে, "...আড্ডা বসতো। যদি মহিলার সংখ্যা বেশি হতো তা হলে বিনয় রাগে (অথবা) অন্য কোনো বিকৃত মনোবিকারের কারণে) কাঁপতো, বই টই যা পেতো ছুঁড়ে মারতো, বলতো আগামী একশ বছরের মধ্যে পৃথিবী মনুষ্যবিহীন হবে, সমস্ত প্রসূতি সদন বন্ধ হবে।' শ্রীমতি দত্তের এই লেখাতেই রয়েছে "বিনয় মাঝে মাঝেই কোনো না কোনো মেয়েকে ওর 'ঈশ্বরী' বানিয়ে নিতো। অজিতা চক্রবর্তী, ফুল্লরা গঙ্গোপাধ্যায়, গায়ত্রী চক্রবর্তী এরকম অনেক।...এদের মাজায়, স্নান করায়, নাম দেয় এও তেমনি।...কোনো বিশেষ রমণীর সঙ্গে এর সম্পর্ক খোঁজা হাস্যকর।...পরে গায়ত্রীর সঙ্গে কথা বলে জেনেছি গায়ত্রী বিনয়কে চিনতো না। একবার বোধহয় দেখেছিল।—এ ছাড়া, ওর বিষয়ে গায়ত্রী আর

বিশেষ কিছু জানে না।" আসলে বিনয়ের গায়ত্রী, বাস্তবের গায়ত্রী কি না সে বিতর্ক অহেতুক হয়ে ওঠে যখন বিনয়ের কবিতার ঈশ্বরী সামনে মূর্ত হয়ে ওঠে। বিনয়ের 'আত্মপরিচয়': 'সৃষ্টির মূল যে সূত্রগুলো তা জড়ের মধ্যে প্রকাশিত, উদ্ভিদের মধ্যে প্রকাশিত, মানুষের মধ্যেও প্রকাশিত। এদের ভিতরে সূত্রগুলি পৃথক নয়, একই সূত্র তিনের ভিতরে বিদ্যমান। এই সারসত্য সম্বল করে ভেবে দেখলাম, জড়ের জীবনে যা সত্য মানুষের জীবনেও তাই সত্য। অতএব জড় এবং উদ্ভিদের জীবন অত্যন্ত মনোযোগ দিয়ে লক্ষ্য করতে লাগলাম আমি। এইভাবে শুরু হলো কবিতার জগতে আমার পদযাত্রা, আমার নিজস্বতা।" এইভাবে সৃষ্টি হ'ল, 'গায়ত্রীকে', 'ফিরে এসো চাকা'। গায়ত্রী বা তাঁর ঈশ্বরীকে নিয়ে বিনয়ের কবিতা ছিল স্বাভাবিক জীবনযাপনের মত আলোঅন্ধকার, প্রেম বিরহের স্বাভাবিক চড়াই–উৎরাই।

একবার এসো ফের; চতুর্দিকে সরস পাতার
মাঝে থাকা শিরীষের বিশুষ্ক ফলের মতো আমি
জীবনযাপন করি; কদাচিৎ কখনো পুরোনো
দেয়ালে তাকালে বহু বিশৃঙ্খল রেখা থেকে কোনো
মানুষীর আকৃতির মতো তুমি দেখা দিয়েছিলে।'

অথবা

...চিন্তা জগতের
সর্ববিধ জটিলতা সরল, সহজবোধ হয়ে গিয়ে ঈশ্বরীরর কাছে
অলস কালোপযোগী ক্রীড়ার বিষয় হয়ে থেকে
বলে যায় আমাদের উজ্জ্বলতা চিরায়ত প্রেমে।

বিনয় তাঁর 'এই সব সত্য' প্রবন্ধে লিখেছেন; 'দৃশ্য বিশ্বে আমি সবচেয়ে বেশি ভালোবাসি অগ্নিকে, তারপর শূন্যকে, শূন্যের দিকে তাকিয়ে আমার মনে হয় শূন্যও দৃশ্য, দৃষ্টিগোচর। শূন্য নিঃসন্দেহে শূন্য। সম্পূর্ণ রূপেই শূন্য। কিন্নতু অদৃশ্য নয়। শূন্যতাও তো দৃষ্টিবোধ এবং ফলে দৃশ্য। অর্থাৎ সবচেয়ে বেশি ভালোবাসি নক্ষত্রকে, সকল নক্ষত্রকে। তবে তারো চেয়ে অনেক বেশি ভালোবাসি আমার ঈশ্বরীকে অর্থাৎ নিজেকে।'

বিনয়ের কবিতা আসলে এক দুরন্ত নির্মাণ কৌশলের অসাধারণ উদাহরণ। এর প্রধান সম্পর্ক প্রেম। যন্ত্রণাতাড়িত, হৃদয় নিংড়ে দেওয়া আর্তিতে ডুবে থাকা ভালোবাসার হীরকদ্যুতিই তাঁর কবিতার বিচ্ছুরণ।

তবু সবুজ বৃক্ষ আর পুষ্প কুঞ্জ যে যার ভূমিতে দূরে দূরে
চিরকাল থেকে ভাবে মিলনের শ্বাস–রোধী কথা।

বিনয়ের কবিতার স্বপ্নদেখার পদ্ধতি, প্রকরণের অন্তর্লীনসূত্র হিসাবে কাজ করেছে। স্বপ্নসংবেদের আলোতেই বিনয় পৌঁছেছেন বাস্তবতার প্রতিপক্ষ কোন আধুনিক বিশ্ববিতৃষ্ণায় নয়, বাস্তবতার সমকক্ষ এক প্রাচীন বস্নতুবিশ্ববোধে। যে বোধের অন্তর্গত বিজ্ঞানদৃষ্টি, নিরাসক্তি এবং প্রশান্তি একান্তভাবেই প্রাচ্যকবিদের ক্লাসিক পরম্পরা: বেদসূক্ত থেকে বাউলগান পর্যন্ত।" (রনজিৎ দাশ)

এক ভিন্ন ধরনের চেতনাজগৎ বিনয় তৈরি করেছিলেন, যা আপাতভাবে সামর্থ্য যুগিয়ে যায়। জীবনের প্রতি আস্থা রাখার শক্তি, যা অবশ্যই ধনাত্মক।" বিনয় ছিলেন এনলাইটেনমেন্টের প্রচণ্ড ভক্ত, হৃদয় থেকে লব্ধ সূক্ষ্মতম সংকেতকেও তিনি যুক্তিশাস্ত্রের অনুশাসনে বাজিয়ে নেন। (অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত)

বিনয় কবিতার শহিদ, বিনয় ভালোবাসার শহিদ। এই প্রেম নৈঃশব্দের, এই প্রেম শব্দবৃক্ষের। প্রথম আড্ডায় বিনয় মজুমদারের আত্মগত উচ্চারণ ছিল 'মহাব্রহ্মাণ্ডে অখণ্ড কণা ঘুরছে, স্বাধীন স্বেচ্ছাচারী।' শৃঙ্খলাবদ্ধ জড়কে ভেঙে ভেঙে এভাবেই অখণ্ড কলার চেহারায় দেখতেন বুঝি তিনি ঈশ্বরীর থেকে ক্রমে ক্রমে এই বিনয় ছড়িয়ে গিয়েছেন আকাশের ঘননীল মুক্তিতে।

বিনয় মজুদারের যাবতীয় সৃষ্টি আসলে এই অনন্তের এপিটাফ। যন্ত্রণাদগ্ধ মানুষের, যন্ত্রণাকে জয় করা মানুষের এপিটাফ; যিনি মনস্তত্ত্বের অধ্যয়ন করেন "সকল ফুলের কাছে এত মোহময় মনে হবার পরেও মানুষেরা কিন্নতু মাংস রন্ধনকালীন ঘ্রাণ সবচেয়ে বেশি ভালোবাসে। ভালোবাসে বয়ঃপ্রাপ্ত জিহ্বা লালাসিক্ত হলে।' এই বিনয় তাঁর গোটা যাত্রাপথকে সূচনাতেই দেখতে পেয়েছিলেন:

আমি যেই কেঁদে উঠি অনিবার্য আঘাতে আহত
তখনি সকলে ভাবে, শিশুদের মতই আমার
ক্ষুধার উদ্রেক হলো, বেদনার কথা বোঝে না তো।

বিনয়ের মত অসাধারণ কবি প্রতিভাকে তাই বিনয়ের ভাষাতেই বলতে হয়:

কবিকে দিও না দুঃখ, দুঃখ দিলে সেও জলেস্থলে
হাওয়ায় হাওয়ায় নীলিমায় গেঁথে দেবে দুঃখের অক্ষর।
কারণ, নিজস্ব জীবন রেখেছে সে
গচ্ছিত সবার কাছে নানান ধরনে অকপট।

সমর সেনের স্কেচ

.....

হঠাৎ সূর্য ওঠে, বলিষ্ঠ প্রহারে
কুয়াশায় নদীর জল ঝলকায়–শাণিত হাতিয়ার।
মাঝে মাঝে বালুচর, কাদা খোঁচা জলে নামে,
ধান ক্ষেতে কাস্তে হাতে কিষাণ
হাতুড়ি বাজে কামারশালে
সবুজ আগুনে জ্বলে অনেক মাঠ।

সমর সেন: সমরে আমারি আত্মীয় সে

'যৌবনের প্রেম শেষ প্রবীণের কামে/বছর দশেক বাদে যাব কাশী ধামে।' (জন্মদিনে) এমনি লিখেছিলেন তিনি, কবিতা লেখা ছেড়ে দেওয়ার মুখে। দেশ ঔপনিবেশিক শাসনের থেকে মুক্ত হওয়ার আগেই কবিতা থেকে মুক্তি নিয়েছিলেন, তিনি সমর সেন, যাঁর কবিতা লেখার প্রারম্ভিক নির্মাণ ছিল এমন–

পাহাড়ের ধূসর স্তব্ধতায় শান্ত আমি,
অমর অন্ধকারে আমি
নির্জন দীপের মতো সুদূর, নিঃসঙ্গ।

তিনি সমর সেন, যাঁর কবিতায় শুরু থেকেই ছিল নতুন ধারার প্রবর্তন। অব্বয়ের পরিবেশ, স্মার্ট, বাঁকা বাঁকা কথা আর গদ্য ছন্দের ব্যবহারে রবীন্দ্রোত্তর বাংলা কবিতার পাঠক রুচিকে পাল্টে দিয়েছিলেন। স্বীয় শ্রেণীঅবস্থানকে গুরুত্ব দিয়ে ঘোষণা করেছিলেন:

গুরুদেব জানতেন কবি অমৃতের দূত।
তাই তাঁর নাট্যে সকল সময়ে হঠাৎ অদ্ভূত
বহুরূপী ঠাকুরদাকে দেখি, কিম্বা কবিকে।
...
আমি রোমাণ্টিক কবি নই, আমি মার্ক্সিস্ট।

১৯৩৪ থেকে ১৯৪৬, এই বারো বছরের কবি জীবন থেকে হঠাৎ সরে যান তিনি। এই নিষ্ক্রমণ নিয়ে বিভিন্ন সময়ে অভিমত উঠে এসেছে। কিন্তু শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত যে সংশয়ী কবিকে আমরা দেখেছি তাঁর লেখা প্রতিটি পঙক্তিতে, হতাশা ও সংশয়ের যে রূপ তিনি এঁকেছেন প্রতিনিয়ত, সেখান থেকে নিষ্ক্রমণের জন্য কবিতা থেকেই সরে যাওয়াটা অবশ্যম্ভাবী ছিল তাঁর কাছে। সংশয় ও প্রশ্নে বিদ্ধ হতে হতে যে প্রত্যয়ে পৌঁছানোর যাত্রা ছিল তাঁর, সেখানে কবিতা তাঁর সঙ্গী থাকে নি। অরুণ মিত্র এই কবি সম্পর্কে বলতে গিয়ে তার কবিতার ছক ও পুনরাবৃত্তির যে প্রবণতা দেখা যাচ্ছিল তার উল্লেখ করেন, 'কবিতার রূপান্তরের মধ্য দিয়ে তা থেকে বেরিয়ে আসতে তিনি পারছিলেন না যেন। এই অবস্থায় কবিতাকে বিসর্জন দেওয়া তাঁর মতো মানুষের পক্ষে স্বাভাবিক ছিল।' কবিতার সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করলেও ব্যস্ত থেকেছেন সাহিত্য জগতেই। অনুবাদ করেছিলেন ভান লুনের Ancient man–এর। কবিতা থেকে মুক্তি নেওয়ার ত্রিশ বছর পরে তাঁর কণ্ঠে তাই কৌতুক, 'সম্প্রতি পুরনো কবিতার কিছু কিছু পঙ্‌ক্তি মনে পড়ে বলে দুশ্চিন্তায় আছি। এ বয়সে কবিতার ব্যামো আবার ধরবে না তো?' এজন্যই হয়ত শঙ্খ ঘোষ লিখেছেন, 'ঝড়ের যে নিঃশব্দ সঞ্চরণের কথা ছিল প্রথম কবিতার বইতে, শব্দের তীব্র আঘাতের যে প্রতীক্ষা ছিল, তার একটা সাময়িক আসন্নতা তিনি দেখতে পাচ্ছিলেন তাঁর চারপাশে, সত্তরের দশকের উদ্বেলতায়।'

যুগযন্ত্রণার দহনে জ্বলছিলেন সমর সেন। আশৈশব প্রগতিশীল সাম্যবাদী চেতনা বহন করেছেন। সমসাময়িক কবি বিষ্ণু দে যেখানে কবিতায় নির্মাণ শৈলীকে অটুট রেখে সমাজের যে অংশের মানুষের স্বার্থপর ও ভণ্ড মুখচ্ছবি তুলে আনেন সমর সেন সেখানে শ্লেষ ও ধিক্কারে তীব্র আঘাত হানেন। হতাশা ও আর্তি, তাই তার উচ্চারণে প্রবল। সমর সেন নাগরিক কবি, তার স্বল্প পরিসর কবিতা ভুবনের অধিকাংশ জুড়ে নগর জীবন,

মধ্যবিত্তের আশা আকাঙ্ক্ষা, নিরাশা ও বেদনার অনুরণন। এই অনুরণন যদিও কখনো কখনো হয়ে উঠেছে ক্লান্তিকর, একই শব্দ ও চিত্রকল্পের পুনরুচ্চারণে সমালোচনার শিকার হয়েছিল তার কবিতা, যেমন

১.
অন্ধকার ধূসর, সাপের মতো মসৃণ
দীর্ঘ লৌহরেখার সহসা শিহরণ

২.
রাত্রে, ধূসর সমুদ্র থেকে হাহাকার আসে,
আর দিগন্তে জমে ইস্পাতের মতো ধূসর আকাশ

৩
পাহাড়ের ধূসর স্তব্ধতায় শান্ত আমি,
আমার অন্ধকারে আমি, নির্জন দীপের মতো সুদূর, নিঃসঙ্গ।

৪
গভীর বনে আর হরিণ নেই,
সবুজ পাখি গিয়েছে মরে,
আর পাহাড়ের ধূসর অন্ধকারে
দুরন্ত অন্ধকারে ডানা ঝাড়ে উড়ন্ত পাখির মতো।

৫
রাত্রির দিগন্ত ঘুরে ফেরে
আদিম জন্মন্তুর মতো বিরাট মেঘ,
সমেঘে পাহাড় আর আকাশ হল ধূসর গম্ভীর।

৬
আমার দেশে দুধারে ধূসর মাঠ,
মধ্যে উদ্দাম নদী
ঝড়, বৃষ্টি, বিদ্যুতে চেরে আকাশ

৭
দিগন্তে ধূসর মাঠে গতপত্র বট
মাথা নাড়ে প্রবীণ ক্লান্তিতে।

সমর সেনের কবিতায় শহুরে সমাজ ‘ধূসর’। ‘হে শহর, হে ধূসর’। তাই তাঁর কবিতায় ছড়িয়ে থাকে ‘ধূসর মাঠ’, ‘ধূসর দিগন্ত’, ‘ধূসর সমুদ্র’, ‘ধূসর পাহাড়’ তার কাছে অন্ধকার ‘ধূসর’। ‘বাইরে এসে দেখি/ তারায় ছেয়েছে বর্ণহীন আকাশ/আর হাওয়া দিয়েছে বিপুল শূন্যতা থেকে / সে হাওয়ায় শুধু যেন শুনি/ কান পেতে শুনি, কোন সুদূর দিগন্তের কান্না।’ এই ধূসর শহরের বিষণ্ন সূর্যাস্তে যেমন কখনো এসেছে ‘মধ্যবিত্তের বিকৃত বিলাস’এর কথা, কখনো পশ্চিমী গণতন্ত্রের নামে ‘দাঁত চাপা বৃদ্ধা গণিকা’র কথাও। বাংলা কবিতায় চল্লিশের শেষার্ধ থেকেই যে বাঁক এসেছিল সে বাঁকেই দাঁড়িয়েছিলেন সমর সেনও। ঘটনার ঘাত–প্রতিঘাতে এ ছিল প্রবল পরিবর্তনের কাল। বিশ্বযুদ্ধ, ফ্রয়েড, ইয়ং, পাভলভ, মার্কসীয় নন্দনতত্ত্বের ক্রমপ্রসার, এর পাশাপাশি বিশ্বের নানা দেশের রাজনৈতিক উথাল পাথাল, এ দেশেও ক্রমশ; নগর জীবনের প্রবল উত্থান বাংলা কবিতাতেও সঞ্চারিত হয়েছিল। আধুনিক কবিতায় আধুনিক জীবন বা নগর জীবনের গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠা স্বাভাবিক। সমর সেনও এই যুগকে অস্বীকার করেন নি। এখানে স্বাভাবিকভাবেই তাঁর অগ্রজ কবি বিষ্ণু দে–র সঙ্গে তুলনা উঠে আসে। এ প্রসঙ্গে ড. বাসন্তী কুমার মুখোপাধ্যায়ের মতো সমালোচকদের অভিমত– “এই দুই কবি পরস্পরের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছেন, এই কথা বলা যায়, যদিও উভয়ের কবি সত্তায় মৌল পার্থক্য বিদ্যমান। উভয়েই বুদ্ধিজীবী হলেও সমর সেনের কবিতা বিষ্ণু দে–র মতো বিদ্যাবাহী নয়। সমর সেনের কবিতা কোন অর্থেই দুরূহ নয় বলে সাধারণ কবিতা পাঠকের কাছে তার একটি সহজ আবেদন আছে। বিষ্ণু দে–র কবিতার মতো সমর সেনের কবিতায় দূরত্বের কাঠিন্য নেই। সমর সেন যখন ব্যঙ্গও করেন, তখন সে ব্যঙ্গের হাত থেকে নিজেকেও নিষ্কৃতি দেন না। পাঠকের সঙ্গে তিনি ‘একাত্ম হয়ে উঠতে পারেন বলে তার বিচার বিশ্লেষণ কোথাও পাঠকের পক্ষে পীড়াদায়ক হয়ে ওঠে না। অবশ্য বিষ্ণু দে যেমন বিচিত্র অভিজ্ঞতার পথে ক্রমশ আত্মপ্রকাশ করেছেন সমর সেনের পক্ষে তার সম্ভব হয়নি।’ সমর সেন কবিতায় সরাসরি বক্তব্যে আসতে চেয়েছেন তাই অনেক সময়ই তাঁর কবিতা হয়ে উঠেছে নিছকই বক্তব্য, কথন। কবিতায় শুধু সমসময়কে তুলে ধরা বা ব্যাখ্যার উদ্দেশ্যে শব্দের পর শব্দ গেঁথে ধরায় অনেক সময় বিপর্যয় নামে, যে বিপর্যয় তাঁর কবিতায় দেখা যায়। শিল্পীর কৃত্য সম্পর্কে ফ্রেডরিক এঙ্গেলস্ এর লেখা একটি চিঠি (মীনা কাউটস্কিকে) এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য, তাতে তিনি শিল্পীকে যা আছে তাকে বিশ্লেষণ করতে উপদেশ দিয়েছেন, কী করা উচিত এই

প্রসঙ্গটিকে তিনি শিল্পস্রষ্টার অবশ্য পালনীয় কর্তব্য রূপে নির্দেশিত করেন নি। দেখা পরিস্থিতি মধ্যে জড়িত ব্যক্তির সঙ্কট ও আত্মবীক্ষণ কবিতার পক্ষেও জরুরি, এই শর্তকে মান্য করলে যা সৃষ্টি হবে তা জীবনানন্দের ভাষায় একান্ত বুদ্ধির রস কিংবা কল্পনার আত্যন্তিকতাপ্রসূত নিরেট জড় উচ্চারণ বিশেষ মাত্রে।

সমর সেন ও বিষ্ণু দে, দুই মার্ক্সবাদী কবি, সাম্যবাদে আস্থা রাখা ব্যক্তির সৃষ্টির অবয়ব পার্থক্যে পাঠকও বিভাজিত হয়ে যায়। সমর সেন স্বাভাবিকভাবেই সমকালীন তারুণ্যের কাছে প্রচণ্ড গ্রহণীয় ও প্রিয় হয়ে উঠলেন, কিন্তু নিজের সৃষ্টির প্রতি তার নিবিষ্ট মনোযোগ নিয়ে প্রশ্ন না তুলেও বলা যায় ভবিষ্যদ্দ্রষ্টার দায়িত্ব তিনি পরিহার করেছিলেন। বুর্জোয়া সমাজ ব্যবস্থায় অস্তিত্ব সর্বদাই আক্রান্ত, অস্থির, মৃত্যুগামী; নিরাপত্তাহীনতা তার সৃষ্টি শক্তিকে পঙ্গু করে, কর্মশক্তিকে নিরুৎসাহ করে দেয়। সংবেদনশীল স্রষ্টা তাই তার এর বিরুদ্ধেই কলম তুলে নেন, নিয়েছেন বারংবার। ঊনবিংশ শতক থেকেই কবি সাহিত্যিকরা সাম্যবাদী চেতনার সংস্পর্শে এসেছেন এজন্য। "শিল্প বিচারের চূড়ান্ত দৃষ্টিকোণ, যে ব্যবস্থার মধ্যে একজন মানুষ হিসাবে নানা দায়ে পীড়িত শিল্পীর অবস্থান তিনি তো তা থেকে অভিজ্ঞ হচ্ছেন ক্রমশ ব্যবহার করছেন এই সব উপাদান যা তাঁর চারপাশে ভাঙছে গড়ছে, পরিবর্তিত হচ্ছে; গৃহীত আর বর্জিত হচ্ছে, হন যদি তিনি নিপুণ শিল্পী, দেখা তাঁর বেদনায় হবে স্নাত, সহানুভূতিতে দ্রব। রাশিয়ার সার্ফদের জীবন যাত্রার অন্তর্গত ছবি টলস্টয়ের মত কে আর দেখাতে পেরেছেন? আর এ কারণেই টলস্টয়ের প্রতি ম্যাক্সিম গোর্কির অভিনন্দন আর অভিযোগ সীমাহীন। বিপ্লবপূর্ব রাশিয়ার বাস্তব চিত্র ডস্টয়েভস্কি গোগল, চেকভ যেভাবে ধরে রেখেছেন তা পাঠান্তে বলতে ইচ্ছা করে My peace is gone, my heart is heavy." (পবিত্র মুখোপাধ্যায়)

ভবিষ্যৎ দ্রষ্টার ভূমিকা নিতে চান নি সমর সেন, তাঁর কবিতায় সমসময় সময়–যন্ত্রণা যে ভাবে উঠে এসেছে সে ভাবে সেখানে আশাবাদী কণ্ঠের উচ্চারণ শোনা যায় নি। 'ভিশন' হীনতা তাঁর রাজনৈতিক দর্শনের পরিপন্থী ছিল, এই স্ববিরোধীতার শিকার হন তিনি। এবং এর ফলে তাঁর কবিতা একসময় জনমানসে যে তীব্র ঝড় তুলেছিল, সময় অতিক্রমেই তা স্তব্ধ হয়ে যায়, থাকে শুধু স্মৃতি রোমন্থন। কবিকে কালে সাক্ষী বলেছিলেন নবীনচন্দ্র সেন, কালচেতনাকে ধরাই কবির একমাত্র কাজ নয়, কী বললেন এবং কীভাবে তা বলা হল–এটাও জরুরি, এখানে সময় সম্পর্কে, সমাজ সম্পর্কে স্পষ্ট দৃষ্টিভঙ্গি ও অভিজ্ঞতা জরুরি। সাহিত্য জীবনের প্রতিফলন, এজন্য তার পারম্পর্যে সমাপ্তি নেই। সাহিত্যে আধুনিকতার বিবর্তনের বা পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে নব নব রূপের আবির্ভাব ঘটে। এই পরিবর্তনের অভিমুখ নির্ণয়ে একজন কবির ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ, সমর সেনের বিশ্বাস এই দিশাপথকে যেদিকে নিয়ে যেতে চেয়েছিল, সমকালকে আঁকতে গিয়ে কালের পঙ্কিল পাঁকে জড়িয়ে গিয়েছিলেন তিনি, তাই তাঁর কোনো উত্তরণের স্পষ্ট কথন পাওয়া যায় না। স্ট্যালিন–এর ভাষায় শিল্পী আত্মার কারিগর, তবে শিল্প নির্মাণ করার সময় কবির কাছে যদি সামাজিক সমস্যাগুলির সমাধান দাবী করা হয় তবে অন্যায় করা হবে। শিল্প মানুষকে নৈতিক ও নান্দনিক দিক থেকে উন্নত করে পরোক্ষভাবে এই সমস্ত সমস্যার সমাধানে সহায়তা করে। এই নিয়ে লুকাসের অভিমত হল মহান শিল্প মানুষকে তার বিকাশ সম্বন্ধে প্রশান্ত ও গভীর সচেতনতা দান করে ও মানুষের মধ্যে সমাজ সম্বন্ধে ইতিবাচক ভূমিকা নেওয়ার জন্য নৈতিক তৎপরতা সৃষ্টি করে। লুকাস তাঁর 'ইস্থেটিকস্' গ্রন্থে লিখেছেন: "এটা অতিরঞ্জন নয় যে শিল্প আবির্ভাব হত না যদি আনন্দ মানুষের জীবনের প্রয়োজনীয় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক উপাদান না হত। আনন্দের পরিধির মধ্যে কোনো রূপের প্রতি ইতিবাচক বা নেতিবাচক সাড়া দেওয়ার অভ্যাসই প্রতিটি শিল্পের উৎপত্তির গুরুত্বপূর্ণ কারণ। সমর সেনের কবিতার পরিণতি সম্পর্কে বলতে গিয়ে এত কথা বলার কারণ এই যে তিনি নিজেই তাঁর রাজনৈতিক দর্শনের ঘোষণা রেখেছেন তাঁর কবিতায়, কিন্তু যাত্রাপথ অর্ধপথ অর্ধসমাপ্ত রেখে বঞ্চিত করেছেন তাঁর স্বতন্ত্র সৃজনধারার সম্ভাবনায় উদ্দীপ্ত কবিতা পাঠককে। সমর সেনের জীবন–দৃষ্টি বা জীবন–আদর্শ তাঁর সমাজদৃষ্টি বা সমাজ দর্শনেরই নামান্তর এবং অবিকৃত প্রক্ষেপণ। কেননা সেই দর্শনের মূলকেন্দ্র বিন্দুই সমাজ, মুখ্য উপজীব্যই সামাজিক শক্তির বিচিত্র প্রকাশ, তার রূপ–রূপান্তর।

সমর সেনের মার্কসবাদী হওয়ার পিছনে নিঃসন্দেহে বড় ভূমিকা নিয়েছিল তাঁর পরিবার। বিশেষ করে তাঁর বাবা অরুণচন্দ্র সেন। 'গৃহস্থ বিলাপ' কবিতায় নিজের বংশ পরিচয় দিয়েছেন সমর সেন:

সপ্তম সন্তান আমি...
আমাদের বংশ
গ্রাম ছেড়ে পিতামহ প্রথম শহরে আসেন।
রক্তে তাঁর কিছু ছিল পদ্মার উদ্দাম বেগ,
সাক্ষী তাঁর ষোড়শ সন্তান।
...
সবুজ চশমা চোখে আমরণ ছিল,
সে সবুজ আদি ভিটের জমিজমার,
কিছু বা আপন পৌরুষের।

পিতামহ ছিলেন প্রখ্যাত দীনেশচন্দ্র সেন, ঢাকা থেকে এপার বাংলায় আসেন তাঁরা। কোলকাতার বাগবাজারের বাড়িতে ১৯১৬ সালে জন্ম নেন সমর সেন। সপ্তম সন্তান। বাবা অধ্যাপক অরুণচন্দ্র সেন ছিলেন শান্তিনিকেতনের ছাত্র, সংস্কৃতি ও রাজনৈতিক জগতের বাসিন্দা। তিনি মার্ক্সবাদে আস্থাশীল ছিলেন। সংস্পর্শে এসেছিলেন বিপিনচন্দ্র পাল, বঙ্কিম মুখোপাধ্যায়, রাধারমণ মিত্রের। তাঁদের বাড়িতে বসত দৈনন্দিন আড্ডা। এই আড্ডায় উঠে আসত সমসময়ের ঘটনাবলি ও তার চুলচেরা বিশ্লেষণ। সমর সেন প্রভাবিত হয়েছিলেন শৈশবেই, মার্ক্সবাদের অনুরাগও তাঁর শৈশবেই ঘটে।

১৯৩২ সাল পর্যন্ত তাঁরা বাগবাজারের বাসিন্দা, তারপর ১৯৩৯ পর্যন্ত বেহালা। কাঁথির প্রভাতকুমার কলেজে সাময়িকভাবে অধ্যাপনাকালে থাকতেন বালিগঞ্জে, ১৯৮০-এর অক্টোবরে দিল্লি চলে যান। ফিরে আসেন বালিগঞ্জে, ১৫ সি সুইনহো স্ট্রিট।

কবি হিসেবে সমর সেনের পরিচিতি ব্যাপক হলেও এর বাইরেও তাঁর বিস্তৃত কর্মভুবন সম্ভ্রম আদায় করে নিয়েছে মানুষের কাছে। মেধাবী ও কৃতবিদ্য এই পন্ডিত মানুষটির কর্মক্ষেত্র অধ্যাপনার বাইরেও স্বচ্ছন্দ্যে বিস্তৃত ছিল, পত্রিকা সম্পাদনায়, সাংবাদিক হিসাবেও তিনি ছিলেন অনন্য, আকর্ষণীয় ও বলিষ্ঠ। *কবিতা* ত্রৈমাসিকের যুগ্ম-সম্পাদকের ভূমিকায় ছিলেন সফল। আকাশবাণী দিল্লিস্থ কেন্দ্রের গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বপালন করেছিলেন। পরবর্তীতে *নাউ* ও *ফ্রন্টিয়ার*-এর পর্ব তো আজ ইতিহাস। সমর সেন তাঁর বিশ্বাসের প্রতি একাত্ম হয়ে লিখেছিলেন–

হঠাৎ সূর্য ওঠে, বলিষ্ঠ প্রহারে
কুয়াশায় নদীর জল ঝলকায়–শাণিত হাতিয়ার।
মাঝে মাঝে বালুচর, কাদা খোঁচা জলে নামে,
ধান ক্ষেতে কাস্তে হাতে কিষাণ
হাতুড়ি বাজে কামারশালে,
সবুজ আগুন জ্বলে অনেক মাঠ।

আর একটি কবিতাংশ–

এ করাল সংক্রান্তি নিঃসন্দেহে পার হব
যে মৃত্যু প্রাণ আনে তার ফিনিক্স গানে
প্রগতির সম্মিলিত বীর্যে, অক্লান্ত আত্মদানে।

অথবা

অপরের শস্যলোভী, পরজীবী পঙ্গপাল
পৃষ্ঠ হবে হাতুড়িতে, ছিন্ন হবে কাস্তেতে।

এই সব পঙ্‌ক্তি থেকেই আশৈশব লালিত তার স্বপ্নের যে রঙের প্রতিফলন আমরা দেখতে পাই, সেটা 'সবুজ আগুন'; কাস্তে ও হাতুড়ির কথা, বিশ্বজুড়ে শ্রমিক কৃষকের সংগ্রামের বার্তা তিনি ঘোষণা করেন। পুঁজিবাদী সভ্যতার মৃত্যুডঙ্কা তিনি শুনতে পান, যা শোনাতেও চান। কিন্তু অভিজ্ঞতাকে অবলম্বন করে এগোতে গিয়ে হোঁচট খান কবি। নিজস্ব বিশ্বাসের ভিত টলে যায়, গভীর হতাশার প্রতিফলন তাঁর কবিতায় ফুটে ওঠে–

শুনি না আর সমুদ্রের গান
থেমেছে রক্তে ট্রামবাসের বেতাল স্পন্দন।
ভুলে গেছি সাঁওতাল পরগণার লালমাটি
একদা দিগন্তে দেখা উদ্যত পাহাড়,
বাইজীর আসরে শোনা বসন্তবাহার।
...
রোমান্টিক ব্যাধি আর রূপান্তরিত হয় না কবিতায়।

এভাবেই স্বপ্ন দেখার সাধ তাঁর কাছে ব্যাধি হয়ে ওঠে। মধ্যবিত্ত চোখ দিয়ে সবকিছু দেখেছেন, নাগরিক চেতনায় মেতেছেন, কিন্তু কখনই তাঁর শ্রেণি-অবস্থানের ঊর্ধ্বে উঠতে না-পারার যন্ত্রণাকে বহন করতে পারছিলেন না। কবি সমর সেন স্বীয় প্রকোষ্ঠ পাল্টে আশ্রয় নেন সাংবাদিক সমর সেনে, অনুবাদক সমর সেনের কাছে। তবে সবসময়ই তিনি ছিলেন 'সমর সেন'। 'বছর দশেক বাদে যাব কাশী ধামে' নয়, ১২ বছর কবিতাকে নিয়ে ঘর করে ঘর ছেড়ে হয়ে যান পুরোদস্তুর সাংবাদিক। ৬২-তে সাম্প্রদায়িক, উত্তেজক খবর ছাপানোর প্রতিবাদে, এক কথায় ছেড়ে দেন একটি বড় হাউসের ইংরেজি দৈনিকের সম্পাদকের চাকরি। শুরু হয় সংগ্রামী সাংবাদিকের জীবন। ১৯৬৪-তে হুমায়ুন কবির তাঁকে ডেকে নিয়ে যান এবং *নাউ* (now) পত্রিকার সম্পাদকের দায়িত্ব দেন। ১৯৬৮- তে *নাউ* থেকে সরে যান এবং শুরু করেন *ফ্রন্টিয়ার* ইংরেজি সাপ্তাহিক। মার্ক্সবাদী চিন্তা চেতনার আদান প্রদানে *ফ্রন্টিয়ার* গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেয়। প্রতিবাদ ও মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য সংবাদপত্রের দায়িত্ব যে গুরুত্বপূর্ণ তা *ফ্রন্টিয়ার* প্রতিষ্ঠা করে। এখানে অজ্ঞাতবাসী ও কারান্তরালে থাকা বিপ্লবীদের লেখাও ছাপা হত। কবিতা থেকে ছুটি নিলেও সমর সেন তাঁর রাজনৈতিক ভূমিকা সম্পর্কে সচেতন ছিলেন এবং তা পালন করে গেছেন সাংবাদিক ও সম্পাদক হিসাবে।

১৯৩৮ সনে কলকাতাতে অনুষ্ঠিত হয়েছিল নিখিল ভারত প্রগতি লেখক সম্মেলন, সেখানে বুদ্ধদেব বসু ও সমর সেন দুটি গুরুত্বপূর্ণ প্রবন্ধ পাঠ করেন। সম্মেলনে সমর সেনের প্রবন্ধটির বক্তব্য তীব্র আলোড়ন তুলেছিল এবং প্রগতি সংস্কৃতি চর্চায় এটি একটি

দলিল বিশেষ। In defence of the decadents শীর্ষক প্রবন্ধটি পরবর্তীতে New Indian literature-এ প্রকাশিত হয়। এই বহুচর্চিত প্রবন্ধে সমর সেন যে বক্তব্য রেখেছেন তা হল– "ধনতন্ত্রী সমাজে যে প্রগতি স্তব্ধ হয়েছে বিপ্লবোত্তর সাম্যবাদী সমাজে তা অব্যাহত থাকবে। ধ্বংসন্মুখ ধনতন্ত্রী সমাজ Decadent, অতএব এ সমাজে সত্য, শিব ও সুন্দরের সাধনা অসম্ভব এবং Decadent সাহিত্যই একমাত্র সাহিত্য।" T.S. Eliot–এর উল্লেখ করে এই সাহিত্যের আন্তরিকতাজনিত বৈপ্লবিক ক্ষমতার উদাহরণ দেন। ধনতন্ত্রী সভ্যতার বর্তমান অবস্থার অন্তঃসারশূন্যতার যে–কোনো রকম অভিব্যক্তিই শক্তি। সমর সেনের এই প্রবন্ধটি সে সময় পক্ষে বিপক্ষে সমালোচনার ঝড় তোলে। সরোজ দত্ত তাঁর আলোচনায় দ্বিতীয় অভিমতটিকে আক্রমণ করে লিখেছিলেন 'এই অভিমতে কর্মভীরু বুদ্ধিজীবীর চিন্তার অন্তঃসারশূন্যতা পরিস্ফুট হইয়ায়েছ।...সমাজ যেখানে Decadent সামাজিক কোনো আন্দোলনকে সেখানে বিপ্লবী রূপ পরিগ্রহ করিতে হইরে আপনার অজ্ঞা হইতে Decadent এর শেষ দাগ পর্যন্ত মুছিয়া ফেলিতে হইবে। সেইজন্য Decadent সমাজ হইতে উদ্ভূত সামাজিক বিপ্লবীর আন্দোলন কমিউনিজম–এ হতাশা, অবসাদ, আত্মবিলাপ, সাফল্যস্বপ্নভীরু পরাজিতের ক্লীব কান্নার স্থান নাই। সরোজ দত্ত এই আলোচনায় এলিয়টকে প্রতিক্রিয়াশীল বিশ্লেষণে বিশেষিত করেন। সমর সেন এই সমালোচনার জবাবে *অগ্রণী* (মে, ১৯৪০) দ্বিতীয় বর্ষ পঞ্চম সংখ্যায় একটি লেখা লেখেন। "সমালোচকের কী কারণে জানি না দৃঢ় ধারণা হয়েছে যে আমি নিজেকে 'বিপ্লবী' কবি বলে প্রচার করি, অথচ আসলে আমি নির্বোধ, কিংবা প্রবঞ্চক, বিপ্লবী নই; এই নিদারুণ জুয়াচুরির জন্য তিনি মর্মাহত ও ক্ষিপ্ত বোধ করছেন। তাঁর এই অভিযোগ সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন। কারণ জ্ঞাতসারে কোনো কবিতা কিংবা অন্য লেখায় আমি নিজেকে 'বিপ্লবী' বলে জাহির করি নি। উপরন্তু কর্মভীরু, পলাতক, আধা–বাস্তব আধা– রোমান্টিকভাবেই আমার নায়ককে বর্ণনা এবং বিদ্রুপ করে এসেছে।"

'...অডেন প্রমুখাদি প্রাগতিক ইংরেজ কবিদের উপর তার প্রভাব অসামান্য।...শক্তি থাকলে ধনতন্ত্রের অনেক গলিত অংশ নিংড়ে বিপ্লবের ফোটা সংগ্রহ করা যে সম্ভব সেটা আমাদের সাম্যবাদী সমালোচক জানেন না কিংবা মানেন না, কিন্তু এলিয়টের Decadence নিঙড়ে অনেক ফোঁটাই আধুনিক ইংরেজ কবিরা কাজে লাগিয়েছেন।

আধুনিক বাংলা কবিতা যাঁরা লেখেন তাঁদের রাজনৈতিক আন্দোলনে যোগদান করেন নি, সেটা আমাদের দুর্ভাগ্য। কিন্তু তাঁদের মধ্যে অনেকেই শক্তিমান লেখক, তাঁরাই এতদিন রাজত্ব করে এসেছেন এবং মধ্যবিত্ত সমাজের উপর কিছু কিছু প্রভাব বিস্তার করতে সমর্থ হয়েছেন, এর কারণ এঁদের অনেকে মধ্যবিত্ত জীবনের গ্লানি এবং বহুমুখী ব্যর্থতা সম্বন্ধে সচেতন, এবং সত্যশিব সুন্দরের অবাস্তব মায়া কাটিয়ে দৃষ্টিভঙ্গি এবং প্রকাশ ভঙ্গিতে পরিবর্তন এনেছেন। নিপীড়িত শ্রেণির আশা ভরসা, কিংবা সংগ্রামের এঁরা সংশ্লিষ্ট নন। এবং যেহেতু যাঁরা সংশ্লিষ্ট ছিলেন এবং আছেন তারা এখন পর্যন্ত বিপ্লবী সাহিত্য রচনা করতে পারেন নি, সেহেতু প্রথমোক্ত ভদ্রলোকদের কানামামা হিসেবে নেওয়াই কর্তব্য। ...বর্তমানে ব্যক্তিগত আক্রমণ এবং নিষ্ফল আক্রোশে সমালোচনার নামে যদি চলে তাহলে বিস্মিত হওয়াটা মানসিক বিলাস, কারণ বাংলাদেশের আজ যে অবস্থা তাতে অগ্রগামী বরক রাতারাতি গুণ্ডাবরকে পরিণত হলেও বাহবা পায়।" এই বিতর্ক যে মূল প্রশ্ন তুলে এনেছিল তার সমাধান আজও হয় নি। শ্রেণি আনুগত্য ও সৃজনের মতাদর্শগত দ্বন্দ্ব না হয়ে নিছক ব্যক্তিত্বের সংঘাতের ঘটনা এক পরম্পরা হয়ে উঠেছে যেন। সমসময়েও চলছে তাই ইতি উতি ব্যক্তিগত আক্রোশের কাদাছোঁড়ার খেলা। সম–সময়েও এই অতীতের বিতর্কটি স্মরণযোগ্য হয়ে উঠছে।

অনুবাদক সমর সেনও তার ক্ষুরধার পাণ্ডিত্য ও স্পষ্ট অবস্থান ঘোষণা করেছেন। মস্কো গিয়েছিলেন অনুবাদকের কাজ নিয়ে, সে সময় ননী ভৌমিক, ফল্গু কর প্রমুখের সঙ্গে ছিলেন। সমর সেনকৃত কার্ল মার্ক্স–এর কবিতার অনুবাদ–

সাধ্যসীমার পরোয়া না করে চলো।
সংঘাত থেকে হটা কখনো নয়
ইচ্ছাশক্তি বর্জিত স্থবিরের মতো
বেঁচে থাকা কখনো নয়

অন্ধ্রপ্রদেশের বিপ্লবী কম্যুনিস্ট কবি চেরবান্দা রাজু–র কবিতার অনুবাদ করেছেন–

এখন বুঝেছি কী থেকে কী হয়,
লক্ষ্য আমাদের উদ্যত
বিপ্লব আমরা আনব অক্লান্ত সংগ্রামে;
তখন তোমাদের হবে শেষ আমাদের শুরু।

গোটা জীবন অস্থিরতায় ছুটে বেড়িয়েছেন সমর সেন; কবিতা থেকে সম্পাদনায়, সেখান থেকে সাংবাদিকতা, সেখান থেকে অনুবাদক হয়ে অন্য দেশে চলে যাওয়া; সবকিছুর পিছনেই ছিল মেধা ও চেতনার দ্বন্দ্ব, তাঁর নিজস্ব শ্রেণী অবস্থাজনিত অন্তর্দ্বন্দ্ব, তাঁর মানসিক অস্থিরতা বাস্তব, কিন্তু এই বাস্তবের ভিত ছিল তার আদর্শবাদ। এই আদর্শবাদ তার কবিতাকে অনেক সময় ভারাক্রান্ত ও স্থূল করেছে, কখন কখন

আর্থশিকতায় ভুগিয়েছে। তবুও তাকে অকবি বলার দুঃসাহস কোনো সমালোচক দেখাতে পারবেন না। সমর সেনের কবিতা–

মাস্তুলের দীর্ঘ রেখা দিগন্তে
জাহাজের অদ্ভুত শব্দ,
দূর সমুদ্র থেকে ভেসে আসে
বিষণ্ন নাবিকের গান।
সমস্ত দিন কাটে দুঃস্বপ্নের মতো;
রাত্রে নিবিড় প্রেম; কুসুমের কারাগার।

অথবা

তাই দিগন্তে কলের বাঁশিতে/মনে হয় পৃথিবীর শেষ প্রান্তে
করাল শূন্যের বৃত্তে/ নাভিচ্যুত শূন্য যেন কাঁদে;
লুপ্ত পাহাড়, লুপ্ত বোধ/শব্দ, গন্ধ, স্পর্শে।

সমর সেনের কবিতায় 'গণজীবনের বন্দনা সঙ্গীত' রচনা করতে চেয়েছিলেন, 'গণ'–র সঙ্গে তাঁর আত্মার বন্ধন ছিল নিবিড়,

'প্রেতলোকে যারা আনে প্রাণের স্বাক্ষর,
কর্ম আর চিন্তা যাদের জীবনে হরিহর,
অমর নমস্য তারা।'

অথবা

জীবাণুর আর দুর্ভিক্ষের সঙ্গে লড়ে যারা
বাঙলাদেশে, উড়িষ্যায়, মালাবারে, উত্তর বিহারে,
যারা লড়ে, ইউগোস্লোভিয়ার বন্ধুর মারাঠি পাহাড়ে,
রাশিয়ার রক্তমাটিতে, বেদনা হলুদ চীনে, ফ্রান্সের ফিনিক্স প্রান্তরে
আমারি আত্মীয় তারা।

সমর সেন বাংলা কবিতার সেই কবি যিনি আন্তর্জাতিক বীক্ষা নিয়ে ঘোষণা করেন

পৃথিবীতে নতুন পৃথিবী আরো
হানো ইস্পাতের উদ্যত দিন

এই 'দিন'–এর ছবিটা কখনও কখনও তাঁর টলে ওঠা বিশ্বাসের পর্দায় কেঁপে উঠেছে এবং যন্ত্রণায় আত্মপীড়নের পথে ঠেলে দিয়েছে তাকে, দ্বন্দ্ব দীর্ণ অন্য এক 'সময়ে'।

হলুদ সূর্যের গায়ে আমার হারাকিরির রক্ত লাগুক

শৌচালয়ের দেওয়ালে মানুষের আত্মাকে ঝুলিয়েছিলেন বোদলেয়ার। বাংলা কবিতার ঘর গেরস্থালির যাবতীয় তুলতুলেপনা ও সংস্কার সৌজন্যকে সপাট থাপ্পর দিয়েছিলেন যে কবি, তিনি তুষার রায়। জীবনজুড়ে অপমান নিয়ে, অবহেলা নিয়ে তিনি কবিতার সঙ্গে সহবাস করে গেছেন। স্ব–সৃষ্ট সংকট, সেটা সামাজিক ও আর্থিক দুই–ই, পুড়ে খাঁক হয়ে যাওয়া কবি তুষার রায় দহনের আঁচ থেকেই তৈরি করতে চেয়েছিলেন অনন্য সিম্ফনি, যা আজও আতঙ্কে ও আহ্লাদে বাংলা সাহিত্য কান পেতে শোনে, গোপনে ও নিভৃতে।

তুষার রায়ের *ব্যান্ডমাস্টার* আমার হাতে আসে কবির মৃত্যু তিন বছর পরে। বিচ্ছিন্নভাবে তুষারের 'বেক্ষাপ্পা' জীবনযাপনের কথা শুনতাম, ছেঁড়া ছেঁড়া কবিতার লাইন শুনেছি বন্ধু কবিদের কাছ থেকে এতে একটা আকুলতা জন্মাচ্ছিল তাঁকে নিয়ে। কিন্তু এই আকর্ষণ তীব্রতর হয়ে উঠল ছোটনাগপুর মালভূমির এক টিলার উপর, ভিন্ন এক পরিবেশে, এক মাতাল মধ্যরাতে।

স্কুল–গন্ডির সীমায় আমরা তখন, নানা 'বৈপ্লবিক' ভাবনায়–পরিকল্পনায় বাতাস টলমল, পা কোন দিকে রাখব বুঝতে না–বুঝতেই বেশ কয়েক কদম এগিয়ে গিয়েছি। মন ভরে অ্যাডভেঞ্চারের নেশা, বন্ধু–বান্ধব মিলে সায়েন্স ক্লাব গড়ে তোলা হয়েছে সদ্য, ট্রেকার্স ক্লাবের পরিকল্পনা চলছে। হঠাৎই খবরের কাগজের একটা খবরে উৎসুক হয়ে আমাদের বিহারের বারহাটে যাত্রা। আমরা চারজন, নেতৃত্বে জিওলজিস্ট প্রদীপ সেনগুপ্ত। দলদলি পাহাড়ের সেই অভিযাত্রা ছিল আদিম মানুষের ব্যবহার করা পাথরের খোঁজে। (সেই অভিযান থেকে পাওয়া নমুনাগুলো জলপাইগুড়ি সায়েন্স অ্যান্ড নেচার ক্লাবের সংগ্রহশালায়

রক্ষিত আছে)। আমরা সেখানে সেচ দপ্তরের একটা পরিদর্শন কুঠিকে শিবির করে কাজ করছিলাম। এক মহুয়া মাতাল চাঁদনি রাতে হঠাৎই কানে এল পাশের ঘর থেকে প্রদীপদার গলা ছেড়ে কবিতা আবৃত্তি–

আমি অঙ্ক কষতে পারি ম্যাজিক
লুকিয়ে চক ও ডাস্টার
কেননা ভারী ধুন্ধুমার ট্রাম্পেটবাদক ব্যান্ডমাস্টার
তখন প্রোগ্রাম হয় নি শুরু সারা টেম্প্রল নাম্নী ক্যাবারিনা
তখন এম্নি বলে ডায়লগ কেটে...'

সেই রাতে যেন তুষার রায়ের কবিতাকে নতুন করে আবিষ্কার করলাম। আমরা প্রদীপদার ঘরে হাজির। তাঁর হাতে *ব্যান্ডমাস্টার* । এর পরে একের পর এক কবিতা পড়া—

আজ আত্মার ট্রিগারে হাত—
সুতরাং চাঁদমারী—/ তোমার গোল চক্কর চোখ বন্ধ করো
আজ একলব্যের নিরলস তপস্যা সিদ্ধ
আজ কাড়ার পিঠ বুলস্ আই বিদ্ধ করে
উড়ে যাবে প্রত্যেকটা নিরিখ
আজ আত্মার ট্রিগারে হাত, আজকের তারিখ/ মনে রেখো

মহুয়ার নেশা চুরমার করে কবিতার বাসুকীমন্থনে উঠে আসা অমৃত ও বিষ, সে সব রাত টলমল।

রুদ্রেন্দু সরকার ও শান্তনু দাশের সম্পাদিত সংকলনে তাঁর ছবি দেখেছিলাম, সিগারেটের ধোঁয়ায় আচ্ছন্ন সেই কবি। বিকাশ, কিশোর, প্রসাদ, নিখিলেশ— আমরা বন্ধুরা তখন তুষার রায়ের আরও কবিতার খোঁজ করছি। তাঁর সম্পর্কে আগ্রহ দিন দিন প্রবল হতে থাকে। জীবন যাপনের যথেচ্ছাচারে যিনি র‍্যাঁবোর কথা মনে করান। কবিতাকে সময়ের সীমাতিক্রমণের দুঃসাহস দেখানোর জন্য যে আত্মনিগ্রহের প্রয়োজন সেই সাহস দেখিয়েছিলেন তুষার রায়।

সেইখানেই তো আড়াল ভেবে আমি একটু
ছুরির ডগায় দোলাতে চাই নগ্ন পাছা
একি ম্যাজিক নাকি উরুগুয়ে গোছের নাট একটা।
আমি বলবো এই সময়ে, এইখানেতেই তো
সাফসুতরো বের করো যার যা কিছু আছে,
কারণ কেবল খাপের ওপর বাঁট দেখিয়ে
মাঠ জিতেছে অনেক রাজা
এবার একটু উদোম হয়ে যার যা কিছু
দাও দেখিয়ে।

বাংলা কবিতার অশান্ত ও অভিমানী সন্তান তুষার রায় তাঁর বিশৃঙ্খল স্বল্পায়ু জীবনকে দহন করেই কবিতাকে পুষ্ট করতে চেয়েছিলেন। নিয়মভঙ্গের খেলায় ছিল তাঁর আনন্দ, তাই মত্ত ছিলেন নিজেকে ভাঙতেও; ভাঙতেও ভাঙতেই ফুরিয়ে ফেলছিলেন নিজেকে। তাঁর অকাল মৃত্যুর পর জ্যোতির্ময় দত্ত লিখেছিলেন– "এটা মৃত্যু নয়, এটা তিলে তিলে বছর পনেরো ব্যাপী আত্মহত্যা।" এই আত্মধ্বংসকারী যুবক জীবদ্দশায় অভিভাবকদের কাছে ছিলেন মূর্তিমান আতঙ্ক, যে নিজে ছিলেন অভিভাবকের স্নেহ ও যত্নের জন্য আকুল, এই শূন্যতাই তাঁকে করে তোলে পরিবার শৃঙ্খলা মুক্ত ও ধ্বংস প্রেমী। যাবতীয় নেশার অধীন হয়ে তিলে তিলে নিজেকে নিঃশেষ করেই যেন পূর্ণ হতে চান এঁরা। তাঁর মতো কবিদের অতি অনুভূতিশীল চেতন জগতেই মনে হয় এই আত্মহননের বীজ লুকিয়ে থাকে।

এখন আমার কোন কষ্ট নেই, কেননা আমি
জেনে গিয়েছি দেহ মন কিছু অনিবার্য পরম্পরা
দেহ কখনো প্রদীপ সলতে ঠাকুর ঘর
তবু বিশ্বাস কর নি
বারবার বুক চিঁরে দেখিয়েছি প্রেম, বারবার
পেশী অ্যানাটমি শিরাতন্তু দেখাতে মশায়
আমি গেঞ্জি খোলার মত খুলেছি চামড়া
নিজের শরীর থেকে টেনে
তারপর হার মেনে বিদায় বন্ধুগণ

তুষার, তাঁর অভিমানী কণ্ঠে কবিতার শেষে লিখেছেন–

গনগনে আঁচের মধ্যে শুয়ে এই শিখর
রুমাল নাড়ছি
নিভে গেল ছাই ঘেঁটে দেখে নেবেন
পাপ ছিল কি না।

জমিদারের রক্ত নিয়ে জন্মেছিলেন। অভিজাততন্ত্রের বিরুদ্ধেই যাঁর কাব্যদর্শন বিদ্রোহ করবে তিনি আভিজাত্যের তোয়াক্কা করবেন না এটাই স্বাভাবিক। যশোর জেলার নড়াইলের জমিদার বংশের সন্তান তিনি। কোলকাতার কাশীপুরে জমিদার বাড়ির বিশাল অট্টালিকা। এখানেই তুষার এক ঠান্ডা, প্রায় অন্ধকার ঘরে, মাদুরের ওপর ছেঁড়া বিছানায় শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। জমিদারতন্ত্রের সমাপ্তি, দেশবিভাগজনিত আঘাতে নড়াইলের জমিদারদের বংশধররা আর্থিক বিপর্যয়ে এইপারে বাস্তবিকই এক বিপর্যস্ত মধ্যবিত্ত পরিবার।

কাশীপুরের তুষারদের বাড়ির রাস্তাটার নাম তাঁর দাদুর নামে, রতন বাবু রোড, এই বাড়িতে তুষারের শেষ জীবনের ছবিটা কেমন ছিল তা *আয়ন্তক*–এর সম্পাদক দিলীপ কুমার রায়ের বয়ানে– 'তুষার রায়ের কাছ থেকে কবিতা নেওয়ার জন্য একদিন তুষারের কাশীপুর রতন বাবু রোডের পৈতৃক নিবাসে হানা দিলাম। সিংহ দরজা শোভিত প্রাসাদোপম অট্টালিকা, সেই মূল তোরণদ্বার অতিক্রম করে প্রাসাদ চত্বরে প্রবেশ করা গেল। এক তলার বিভিন্ন ঘরের খোপে খোপে ভাড়াটে। বিশাল আকৃতির থাম সম্বলিত দীর্ঘ বারান্দা যুক্ত সুবিশাল জমিদার বাড়ী। কিন্তু স্থানে স্থানে পলেস্তারা খসা, ভগ্নপ্রায়, কেমন যেন মলিন পরিচর্যাহীন। মানুষের কাকলী সেরকম শোনা যায় না। লোককে জিজ্ঞাসা করে ভয়ে ভয়ে প্রায় অন্ধকার সিঁড়ি দিয়ে দোতালায় উঠলাম।... তুষার ঐ ঘরে ভূমিশয্যায় শায়িত ছিলেন। তুষার আমাদের সামনে এসে দাঁড়ালেন। তার পোশাক পরিচ্ছদ অতি দীন। পরনে একখানি গামছা, গায়ে গেঞ্জি অথবা ময়লা শার্ট। শরীর শীর্ণকায়। উজ্জ্বল চোখ। এককালের শারীরিক সৌন্দর্য অনেক অনিয়ম, অনাচার ও বাউন্ডুলের নেশায় আজ বিধ্বস্ত। ...'(কবি সম্মেলন আগস্ট ২০০৭)

এহেন তুষারের একমাত্র ও শেষ আশ্রয় ছিল কবিতা। জন্মেছিলেন কোলকাতাতেই, ১৯৩৫ এর ২৬ মে, এই কাশীপুরেই। বাবা বনবিহারী রায়, মা বকুল রাণী। বনবিহারী বকুল রাণীর দশ ছেলে মেয়ে, এই বিরাট পরিবারকে টানার মত সামর্থ্য এই ভগ্ন–জমিদারের ছিল না। স্বাভাবিকভাবেই তৃতীয় পুত্র তুষার ও অন্য ভাই ফাল্গুনী অযত্ন ও দারিদ্র্যের বাতাবরণকেই পরিবারের উপর চেপে বসতে দেখেছেন। যার প্রভাব ক্রমশ এদের জীবনযাত্রাতেও ছায়া ফেলেছিল। তুষার একটা সময় কবিতার থেকে বেশি আগ্রহী ছিলেন রং তুলিতে। আর্ট কলেজেও প্রথাগত শিল্পী হওয়ার চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু ধারাবাহিকতার মধ্যে থাকার মানুষ তিনি ছিলেন না। তাঁদের পরিবার বড় হলেও সেখানে সংস্কৃতি চর্চা ছিল বেশ প্রবল। দাদা বিমল নাট্য আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন, ভাই ফাল্গুনী রায়ের কবিতা বাংলা কবিতাকে সাবালকত্ব দেওয়ার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছে। তুষারের মৃত্যুর পর অজয় নাগের লেখা থেকে জানা যায় যে তিনি দেওঘরে থাকাকালীন একটি মেয়ের প্রেমে পড়েন। ঐ অবাঙালি মেয়েটি তুষারের জীবনে একটা গভীর ক্ষত হয়ে রয়ে যায়। যন্ত্রণার একটা উৎসও হয়তো ঐ ব্যথাতুর স্মৃতি। তার ৩০–৩২ বয়সের সময় চাকরির চাহিদা তৈরি হয়েছিল এবং ১৯৬৫ নাগাদ ভিলাইতে চাকরি নিয়ে যান, কিন্তু তাও ছিল ক্ষণস্থায়ী।

তুষারের রায়ের প্রথম কবিতার বই *ব্যান্ডমাস্টার* প্রকাশিত হয় ১৯৬৯–এ। এর প্রচ্ছদ আঁকেন কবি স্বয়ং। হলুদের ওপর নেভী ব্লু লেটারিং, ছবি নয় কবিতার বইয়ের নাম ও কবিতার লাইন ব্যবহার করেন তিনি প্রচ্ছদে। ৩২টি কবিতা নিয়ে বইটার দাম দু টাকা। বইটি প্রকাশের পরেই প্রবল আলোড়ন ওঠে। *দেশ*–এর সাহিত্য সংবাদে সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় (সনাতন পাঠক) লেখেন "তুষার রায়কে তরুণ কবিদের মুকুটহীন রাজা বলা যায়। কবিতার সমস্ত প্রথাসম্মত রীতি ভেঙেচুরে শব্দের জগতে একটা বিপ্লব ঘটিয়ে তিনি সম্পূর্ণ নতুন কবিতার জন্ম দিতে চলেছেন। এমন কবিতার আবির্ভাব যে কোন সাহিত্যের পক্ষেই একটা শুভ ঘটনা।" এই *ব্যান্ডমাস্টার* আবার ১৯৯৩তে নতুন করে প্রকাশিত হয়, প্রকাশক 'আনন্দ ধারা'। *ব্যান্ডমাস্টার* প্রকাশের পেছনে প্রথমবারের মতনই এবার অজয় নাগসহ তিন 'সাহিত্যপ্রিয় ছাত্র'র ভূমিকা ছিল মুখ্য। প্রথমবার প্রকাশের পর ৫০০ কপি সে বছরই শেষ হয়ে যায়। এরপর তুষারের কয়েকটি ছোট গদ্য বই ও ছড়ার বই প্রকাশিত হয়। তুষারের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ কবিতার বই 'মরুভূমির আকাশে তারা', প্রকাশ করেছিল 'আনন্দ পাবলিশার্স'। বইটি এখন দুর্লভ। তুষার কবিতায় যেমন শব্দ ব্যবহারে ছিলেন দুঃসাহসী, তেমনি তাঁর শ্লেষ ছিল ভয়ানক–

কে কতো পবিত্র পুরুষ, সিংহের মতো বিজনে
সন্ধ্যায় হুঙ্কার ছাড়ে যা শোনায়
ঠিক যেন মেঘ গর্জন
অথচ এতো যে তজ্জন কাড়াকাড়ি মাছ নিয়ে মার্জার,
কেউ ফের ভাদ্রের কুকুর হয়ে ডাক পাড়ে ঘেউ, ফের কেউ
পাকা চুলে কলপ লাগিয়ে সাজে রাজেল রাগী ছোকড়া
কেউ অচিন্তনীয় হাংরিদের টেংরী চেটে
কবিতায় লেখেন—তুমি নারী রমণ কুশলা'
(ইট)

তুষারের ছোট ভাই ফাল্গুনী হাংরি ঘনিষ্ঠ ছিলেন। কবিতার ব্যাপারেও দুভাই ছিলেন দু মেরুর। ফাল্গুনী ছিলেন প্রবল প্রতিষ্ঠান বিরোধী, তুষার এসবের তোয়াক্কা করতেন না,

এজন্য দাদাকে ছোট ভাই 'প্রতিষ্ঠানের চাকর' বলে আক্রমণ করতেন। এর জবাব কি এই 'ইট'? তবে দাদার মৃত্যুর পর ফাল্গুনী একটা মর্মস্পর্শী লেখা লেখেন। ভালোবাসার জন্য যে আকুল একটা বাসনা তুষারের মনের ভেতরে ডুকরে কাঁদত তা অনেক কবিতাতেই টের পাওয়া যায়–

বারংবার চেষ্টা করেও কামড়াতে পারি নি আমি
কুকুরকে, এমনকি সামান্যতম বিষও নেই দাঁতে
শুধু হাতে আছে কলম, মাথায় কিছুটা বুদ্ধি আর
আর খানিকটা প্রেম আছে বুকে।
(শুনে যাচ্ছি সুদ ও শুয়োর)

শুধু প্রেম নয়, পারিবারিক স্নেহ, মাতৃস্নেহের আকুল ছিলেন তিনি। মা দিদিদের বাড়ি থাকতেন, বাড়িতে অসুস্থ অনাদরে পড়ে থাকা সন্তানের কবিতায় মা এসেছেন যেভাবে–ভারী বায়োবীয় আরাম একখানা যাকে বলে/ তিন তুলিতে ফাঁকি দিয়ে পাওনা কারলী/ রক্তে যৌন ধিকিধিকি/ কোর্ট পেয়াদা কোন শাঃ ধরবে ধরুক দিকি/ তবু মুখটা দেখে মনে হল ওরকি মনে পড়ে যাচ্ছে/ মায়ের কথা?/ রান্নাঘর কুটনো বাটনা/ দিদির বাড়ী যাওয়ার কথা ছিল পাটনায়, / মা কি ডাকছে? (মা কি ডাকছে)

তুষার তাই বলে কখনই ব্যক্তিগত অতৃপ্তি, আকুতি নিয়েই বাঁচেন নি। সময়ের যন্ত্রণাকেও বহন করতেন তিনি, সচেতন ভাবে ও বিপ্লবীর মত।

পিছু হটতে হটতে পিছু হটতে হটতে/ তিন দেওয়াল
দাঁত ঘসে তবু একবার শ্লোগান দাও/ আমরা জেগে উঠব আবার
জেগে উঠব নিশ্চিত, তাহলে যারা/ প্রথম বিক্ষোভের দিনে
বন্দুকের নলে ঢুকে বসেছিল,
মালার বদলে বুলেট গেঁথে ছিল যারা তারাই
দেখ ব্যর্থ বুলেট হয়ে ফিরে আসে/ ফুটপাতের ধুলোয়। (ফিরে আসে)

নকশালবাড়ি তখন ফুটছে। কলকাতার, মূলত, শিল্পী কলাকুশলীরা নিয়মিত আয়োজন করছেন 'মুক্তমেলা'র, প্রতি শনিবার। তুষার ছিলেন অনন্য ছড়াকার, এর প্রমাণ রেখেছিলেন এই মুক্তমেলাতেও, আড্ডায় যেভাবে দুর্দান্ত পাঠভঙ্গিতে জমিয়ে দিতেন, সেভাবে এই মেলাতেও তাঁকে ঘিরে ভিড় জমত। পুলিশকে নিয়ে তাঁর ছড়া সে সময় মুখে মুখে ছড়িয়ে গিয়েছিল–

পুলিশ ওরে পুলিশ
কবির কাছে আসার আগে
টুপিটা তোর খুলিস।

অথবা বাক্‌রুদ্ধ করে দেওয়া তাঁর আর একটি কবিতা–

... সেই কবি মিছিলের ঠিক পুরোভাগে ছিল
তিনটি বুলেটে ঠিক মৃত্যুকে কিনে শুয়ে আছে। (কবি ও তাঁর সমাধি)

তুষার এভাবেই মৃত্যুকে আলিঙ্গান করেছেন। এই আলিঙ্গান ছিল সচেতন, হয়তো তাই কবিতায় আগেই লিখেছিলেন–

ক্ষয়ক্ষতি কিংবা জয়ের মাল্য দুই–ই অদৃশ্য
দৃশ্য জোড়া নিজেরই তলপেট আমার সামনে
আমার শিল্পই আমার হাতে পৌঁছে দেয় ছুরি।
হলুদ সূর্যের গায়ে আমার হারাকিরির রক্ত লাগুক।
(হারাকিরি)

তুষার সম্পর্কে লিখতে গিয়ে অজয় নাগ কবির একটা অদ্ভুত খেলার শখের উল্লেখ করেছেন। মার্কিন মুলুকে দুর্বিনীত কিশোরদের মধ্যে যে খেলার মধ্য দিয়ে মৃত্যুকে চেখে দেখার কথা শোনা যায়। "খেলাটা ভারী মজার, রাস্তার সিগন্যাল না মেনে চলন্ত গাড়ীর গতিকে ফাঁকি দিয়ে ফুটপাত বদল করার, যেন এক জীবন পার হয়ে অন্য জীবনে যাওয়া। এতে যে কোন সময় মৃত্যু আসতে পারে।...তুষার বলতেন, মৃত্যু নয় জীবনের খেলা।" এই খেলার আর এক সঙ্গী চিত্রশিল্পী পৃথ্বীশ গঙ্গোপাধ্যায় আজ আর নেই, ভাস্কর চক্রবর্তী সদ্য প্রয়াত হয়েছেন। তুষারের মৃত্যু নিয়ে খেলা নয়, মৃত্যুকে আলিঙ্গানের পর কবি বন্ধু কবি ভাস্কর চক্রবর্তী লিখেছিলেন: আমি সকালবেলা, ঝুঁকে পড়ে দেখছিলাম, তুষারের দু চোখের নীচে শুকিয়ে যাওয়া কোন জলের রেখা আছে কি না। না নেই। ছিল না। মেঘের সকাল বেলায় তুষারের হলঘরের বারান্দায় দরজায় হাত দিয়ে, একা দাঁড়িয়েছিলাম। আমার চোখে জল আসে নি।... আমরা লিখেছিলাম, ভোরবেলার যে আলোয় সমস্ত অসুখ সেরে যায়। শেষ পর্যন্ত আমাদের কোন অসুখ সারে নি।' আজ তার মতোই বলতে হয় তুষার এই সময়েরর উপযোগী ছিলেন না, সময়ের যোগ্যও নয়। শেষের দিকে তিনি লেখেন 'এইবার জীবনকে পালটে সাজানোর সময় এই সময় দেয় নি। সেদিন ছিল ১১ই সেপ্টেম্বর ১৯৭৭, এক তরুণ কবির দীর্ঘ আত্মহনন যাত্রার সমাপ্তি: মাঝ রাতে একটা ব্যথা বুকের মধ্যে/ একবার ডানদিক একবার বাঁ দিক/ নড়ে চড়ে বেড়াতে লাগল/ প্রকাশ্যে দিবালোকে মৃত্যু মৃত্যু খেলাটা হবে/ আমরা হাসতে থাকব তালি দিতে দিতে...সকালের আড়ালে সময়ের নীচের স্থির জল/ তাকে কি হাতছানিতে ডেকে ছিল? (মৃত্যু মৃত্যু খেলা)

.....

আমি দেওয়ালে কখনো পাখি আঁকি না বা ফুল
আঁকি শাণিত হাঙর বা করাল তিমি, আমি উনুন আঁকি
গরম জল ফুটছে উনুনের ওপর সাড়াশি আঁকি
আঁকি একটি পুরুষ বাঁদর অপর একটি স্ত্রী বাঁদরকে দমন করছে
নাভির যে ঘা আছে নক্ষত্র আছে
জ্বলন্ত কয়লা দিয়ে সেই ঘা আর সেই নক্ষত্র আঁকি

শামশের : সশস্ত্র এক আধুনিক কবি

শামশের আনোয়ার, ষাটের প্রধানতম কবি, প্রায় নিঃশব্দে ও অনায়াসে যিনি মুঠো ভর্তি স্বেচ্ছা–আহুত মৃত্যুর উপত্যকতায় চলে যেতে পারেন, মৃত্যুর পর মাত্র এক দশক অতিক্রমেই কি তাঁর 'কলম বিসর্জনে' যাওয়ার মতো ক্ষণস্থায়ী, অস্বচ্ছ, চটুল। অজস্র বারুদকণা, Spelter ঠাসা মাত্র তিনটে বই, যেন এক একটা শক্তিশেল যা এখনও আমুদে পাঠকের মগজের দিকে তাক করা, আক্রমণ উদ্যত। শামশের, ভাস্কর, তুষার এক একটা কবিতার স্বতন্ত্র স্থলভূমি, যেখান থেকে শব্দের পাঠ নিয়ে নতুন যাত্রাপথে চিনে নিয়েছে অজস্র তরুণ অভিযাত্রী। প্রতিষ্ঠানের প্রতি চরম উপেক্ষার স্পর্ধা দেখানোর সাহস ছিল এঁদের, হয়ত তাই বাণিজ্যনিয়ন্ত্রিত আলোকমঞ্চের স্পটলাইটের আড়ালে চলে যাচ্ছেন শামশেররা। সম্প্রতি তারই মত মৃত্যু উপত্যকায় পাড়ি দিয়েছেন সন্দীপন চট্টোপাধ্যায়, শামশেরের মৃত্যুর দিন রাতে লেখা সন্দীপনের ডাইরির পৃষ্ঠা–

'আজ সকাল ৮-টায় শামশের আনোয়ার শামশেরকে মেরে ফেললো। আত্মহত্যা করার কথা থাকে অনেকেরই, অনেকেই করে না। প্রয়োজনও থাকে না। কারণ মৃত্যু তো আগেই হয়ে গেছে, শামশের ভীষণভাবে বেঁচে ছিল। তাই, কলকাতার সাহিত্য–সংসারে সে ছিল একজন প্রকৃত একঘরে কবি।...তাঁর কবিতা কোনো প্যাটার্নে পড়ে না। অনুসৃত হয় না। স্বীকৃতি পায় না সমকালে। কেউ বুঝতেই পারে না...।" ডাইরির পৃষ্ঠায় সংযোজন ছিলো "জীবিত কবিদের নিয়ে যা ইচ্ছে হোক। আমার ভাবনা হচ্ছে এই মৃত কবিকে নিয়ে— কেননা কবির মৃত্যু বাণিজ্য হয় না, মৃত্যুর পর খ্যাতিকে কেউ আটকাতে পারে না।" কিন্তু মৃত্যুর পরও শামশের সেই খ্যাতির ছোঁয়া পেল কই? আসলে সমাজের প্রতি শামশেররা এবং শামশেরদের প্রতি সমাজের আচরণে এটাই স্বাভাবিক। নৈরাশ্য ও নৈরাশ্যের ধুধু প্রান্তরের মধ্যে একাকী কবি তাই শূন্যায়তনের পাঠকৃতি–

আমি জানি মানুষের কোনো উত্তরণ ক্লিও–র আঁচলে বাঁধা নেই
এই কলকাতা আর আমার নিঃসঙ্গ বিছানা ছাড়া কোনো সত্যের
অপেক্ষা আমি রাখি না।...
প্রেম আর স্মৃতি আমি উড়িয়ে দিয়েছি সিগারেটের ধোঁয়ায়
জ্বর আনে নি তবুও আমি জ্বরের ঘোরেই বাঁচি।

পঞ্চাশের দশকে বাংলা কবিতাতেও আধুনিকতাবাদের নামে যে দিশাহীন মায়াজাল ব্যাপ্ত হচ্ছিল। কবিতাকে নেতিবাদ ও নৈরাজ্যের প্রতিফলিত ধ্বনির বোধহীন উচ্চারণে পর্যবসিত করছিল, ষাটের দশকের তারুণ্যকেও তা স্পর্শ করেছিল। অর্ধশতাব্দী পরে সময়ের চাকা ঘুরতে ঘুরতে আবারও যখন তত্ত্বহীনতাকেই তাত্ত্বিক সমর্থন জুগিয়ে যাওয়ার চেষ্টায় কবিতাকে ঠেলে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে "ইতিহাস–ঐতিহ্য–সমাজ–মূল্যবোধকে বিরোধীতার চক্রব্যূহে" তখন যেন শামশের, তুষাররা বেশি করে প্রাসঙ্গিক হয়ে ওঠেন।

আমি শুয়ে রয়েছি—
পাশেই ঘুমিয়ে আছে পাঁচ ফুট ছয় ইঞ্চি লম্বা আমার জিভ
আমি নড়ছিনা, পাছে আমার জিভের

ঘুম ভেঙে যায়, জেগে উঠে সে
আস্তে আস্তে পেঁচিয়ে ধরে আমার
গলা, মেরে ফ্যালে

১২ জুন, ১৯৯৩। হাসপাতালের সাদা বিছানায় আমন্ত্রিত মৃত্যুকে জড়িয়ে শুয়ে আছেন শামশের, জীবনানন্দ–উত্তর বাংলা কবিতার এক ব্যতিক্রমী কবি। ষাটের যে কয়েকজন কবির উচ্চারণে বাংলাভাষার প্রাঙ্গণে অন্যরকমের ধ্বনি জাগছিল তাদের প্রধানতম এই শামশের আনোয়ার। মাত্র তিনটি কবিতার বই, ছড়ানো ছিটানো আরও কিছু কবিতা ও প্রবন্ধ রেখে বিদায় নিলেন। শামশের কাব্যিক বিদায় নিলেন ঠিক নয়, এক ধরনের নির্মম আক্রমণের কাছে অসহায় আত্মসমর্পণ ছিল তাঁর মৃত্যু। শামশের, যার প্রিয় গাণিতিক সংখ্যা...শূন্য

প্রিয় আশা... ২০০ টা কামপোজ অথবা দুশোটা সাদা পরী
প্রিয় পাখি... কাক
প্রিয় গাছ... ভেরেণ্ডা
প্রিয় সৃষ্টি... অপ্রেম
জীবনের সবচেয়ে অন্তরঙ্গ মুহূর্ত...পদস্খলনের আগের মুহূর্ত।
(ক্রুসেড)

শামশেরের প্রিয় তরুণ কবি ছিলেন শ্যামল সিংহ। শামশেরের মৃত্যুর খবর পেয়ে শ্যামল লিখেছিলেন, "গ্রীষ্মের এক ঘোর সন্ধ্যায়, জলপাইগুড়ির বাড়ীতে, উঠোনে দাঁড়িয়ে আকাশের দিকে আঙুল তুলে শামশের আমাকে দেখিয়েছিলেন জ্বলজ্বলে একটি তারা... শামশের এক বুক রক্তক্ষরণ, আর সেই থেকে কখনো কখনো ঘণ্টা ফাঁটিয়ে আর কখনো কখনো জ্যোৎস্না ফাটিয়ে অদ্ভুত এক সাদা পালকের খোঁজে বেরিয়ে পড়েছিলেন তিনি।" চূড়ান্ত বৈভবের মধ্যে বড় হয়েছিলেন তিনি, আবার চূড়ান্ত অন্ধকারের মধ্যেও হাতড়ে হাতড়ে চলতে হয়েছে তাঁকে। স্বাতন্ত্র্য চিহ্নিত করতে চেয়েছিলেন তাঁর প্রতিটি হামাগুড়িকে, সুড়ঙ্গের ওপারে আলো থাকলে তা এই ভিন্নধর্মী চিহ্নগুলিকে চিহ্নিত করবেই, এই প্রত্যাশা তাঁর ছিল। কিন্তু আত্মবিশ্বাস আর প্রত্যাশার ভারসাম্য খুঁজে পাচ্ছিলেন না তিনি।

ক) ভগ্ন প্রাসাদ, বালক রাজার সশক্ত খেলনা—
ফুরাবে জানি, তবু এখনও যে ছোটে অন্ধ, বিরহী উল্কা।
(আমার কবিতা)

খ) আমরা নাচি আর নাচি আর গান করি 'প্রেমহীনতা'
আমরা গান করি 'মদ'
...
আমরা গান করি ঈর্ষা
আমরা গান করি 'উষ্ম লাভা'
আমরা গান করি 'অনন্ত ঠাণ্ডা'
আমরা নাচি আর নাচি আর গান করি 'প্রতারণা'
আর আমরা খুব তাড়াতাড়ি মরে যাই

গ) আমার ঘরের ফ্যানের দিকে গোলাপ ফুলের
চিত্রিত রুমাল ঝুললে
ঐ রুমালই তো সেই আহ্বান যাকে আমরা ফাঁস বলি

জীবনের এই আহুত শেষপর্বে শামশেরকে অবসাদ–অসার্থকতার বোধ আত্ম–সংবৃত করে দিয়েছিল। তিনি প্রতিনিধিত্ব করেছেন যে সময়কে, সেই ক্ষয়িষ্ণু কালপর্বের গরল কণ্ঠে নিয়ে দহনে জ্বলেছিলেন কবি।

১৯৯৩ এর জুন থেকে এই ২০০৭–এর অক্টোবর, মৃত্যুর দেড় দশকের মাথায় দাঁড়িয়ে সমস্ত কবিকে মাথা গুনতিতে বাদ দেওয়া অসম্ভব তেমনি একজন শামশের। যিনি ষাটের দশকের বাংলা কবিতার ভাঙন বিস্ফোরণের অন্যতম ক্যাপ্টেন, যিনি বাজার চলতি পত্র–পত্রিকার নিয়মিত কবি হয়েও ছিলেন বাজার চলতি সাহিত্যের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ, স্বাতন্ত্র্য উজ্জ্বল এক কবি। নতুন প্রকাশভঙ্গি, নতুন চিন্তা ও পর্যবেক্ষণে কবিতাকে তিনি সময়–সূচক করে তুলেছিলেন, স্বীয় পরিমণ্ডলেও যিনি ছিলেন স্বতন্ত্র ও বিশিষ্ট। যার উচ্চারণ ছিল এমন–

আমি দেওয়ালে কখনো পাখি আঁকি না বা ফুল
আঁকি শাণিত হাঙর বা করাল তিমি, আমি উনুন আঁকি
গরম জল ফুটছে উনুনের ওপর সাড়াশি আঁকি
আঁকি একটি পুরুষ বাঁদর অপর একটি স্ত্রী বাঁদরকে দমন করছে
নাভির যে ঘা আছে নক্ষত্র আছে
জ্বলন্ত কয়লা দিয়ে সেই ঘা আর সেই নক্ষত্র আঁকি

যিনি নিজের কবিতা দর্শন সম্পর্কে বলতে পারেন: 'ইনসমনিয়া নাইট মেয়ার, নার্ভাস ব্রেকডাউন অর্থাৎ ফিয়ার অব সাইকোসিস ছাড়া আমার পক্ষে সম্ভব হতো না কবিতা লেখা আর এটাই প্রকাশ করে একজন প্রকৃত কবির কবিতা লেখার অথেন্টিক প্রসেস।' যাঁর কবিতা নিয়ে বলতে গিয়ে অগ্রজ সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় বলেন যে, "শামশের আনোয়ার

বিশুদ্ধ শব্দ নির্মাণের কবি।... কোন কবিকেই সম্পূর্ণভাবে চেনা যায় না। মানুষ হিসেবে, কবি হিসেবে। প্রত্যেক প্রকৃত কবিই আস্তে আস্তে নিজের চারপাশে একটা অস্বচ্ছ বৃত্ত তৈরি করে নেন, স্বেচ্ছায় কখনো তার থেকে বেরিয়ে আসেন, আবার অনেক সময় অগোচর থাকতেই পছন্দ করেন। কখনো কখনো বৃত্তে সংঘর্ষও লাগে।" *কৃত্তিবাস* থেকে প্রথম যে তরুণ কবিকে পুরস্কৃত করা হয়েছিল তিনি শামশের আনোয়ার। মুষ্ঠিমেয় যে কয়েকজন কবির কবিতা বাংলা কবিতাকে আন্তর্জাতিক কবিতার উচ্চতায় নিয়ে যাওয়ার স্পর্ধা রাখে শামশের তাঁদের অন্যতম। এস্টাব্লিশমেন্ট–এর সমর্থন পুষ্ট হয়েও যে কবিতা তার বিপরীতে ও বিরুদ্ধে দায়িত্বশীল, লিট্‌ল ম্যাগাজিন অনুসৃত যে সমান্তরাল ভিন্নতর কবিতা স্রোত তার পুরোভাগে থেকেছে শামশেরের কবিতা।

এমনই এক বিরাট নিশ্চল অমাবস্যা সেই সুযোগে এক কালান্তর বিছে
মারাত্মক স্থির প্রতিজ্ঞায় হুল বসিয়ে দিল আমার আত্মায়।
(একটি আধুনিক ঘটনা)

এই বিষের যন্ত্রণা কবিকে আমৃত্যু বহন করতে হয়। শামশের গভীর আত্মদহন আর বিবিক্ত অভিমানে জীবন থেকে মৃত্যুর উপত্যকায় চলে গিয়েছেন। ষাটের এই পুরোধা কবি প্রতিনিধিত্ব করেছেন ক্ষয়িষ্ণু কালপর্বের। ড. তপোধীর ভট্টাচার্যর ভাষায় বলতে হয়– 'স্বদেশ–সমাজ–ইতিহাসের পালাবদলের দিনগুলিতে চরম বিচ্ছিন্নতার সর্বগ্রাসী অন্ধকারই সে দিনের বহু তরুণ কবির কাছে সার্বভৌম ও অবিকল্প হয়ে উঠেছিল। নাস্তির তিমির তখন এতই দুর্ভেদ্য যে দান্তের নরকও সম্ভবত কাম্য তার চেয়ে।' যে দহনকে কালান্তক নেশার ধোঁয়ার মত বুকে টেনে নিয়েছেন তার স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়ায় জ্বলে ওঠা সত্তার ছবিটা বুঝি এমনই হয়–"এখন গোপন হত্যায় কটু কামবিলাসিনী ঐ ঊষার দগদগে গোলাপী রঙ ছড়িয়ে আছে আমার আত্মায়।"

যেভাবে এর আগে লিখেছেন–

ক) প্রেম আর স্মৃতি আমি উড়িয়ে দিয়েছি সিগারেটের ধোঁয়ায়
জ্বর আসে নি তবুও আমি জ্বরের ঘোরেই বাঁচি
(মা কিংবা প্রেমিকা স্মরণে)

খ) সংগমের ইচ্ছা হলে নিজেকে জড়িয়ে ধরে সংগম করি
অন্ধকারের নর্দমায় আমি কীট হয়ে অন্ধকার খুঁড়ে খাই
অন্ধকারের সমুদ্রে অন্ধকার পান করে বেঁচে থাকি–(ঐ)

শামশেরের কবিতায় বারংবার 'আমি' এসেছে। এই 'আমি' আসলে সময়াক্রান্ত উন্মুক্ত মানবসত্তার উন্মোচন–ঘটিত, যন্ত্রণাঘটিত ব্যক্তি মানুষের প্রতীকী উচ্চারণ, এ প্রসঙ্গে মনে পড়ে হেলেন সিক্সের কথা। "The I is always more than one, diverse capable of being all those it will at one be, a group acting together." যাইহোক, ষাট–সত্তরের অনেকের মতই শামশেরের 'আমি'ও এমন প্রতিনিধিত্বমূলক উচ্চারণ যে একটি বিভ্রান্ত প্রজন্মের আত্মিক স্থবিরতার মধ্য থেকে বহুর ছবি তুলে ধরে। "আধা সামন্ততান্ত্রিক ও আধা ধনবাদী সমাজব্যবস্থা যে সভ্যতার সংকট সৃষ্টি করে ও ভারসাম্যহীনতার জন্ম দেয় এবং তার কবলে পড়ে মানুষ যে দুঃস্বপ্নগুলি দেখে, বহন করে যে মুক্তির আকুতি, তারই রক্তক্ষরণের গান ও স্বপ্ন শামশেরের কবিতা। (ক্রুসেড)

শামশের সম্পর্কে তাঁর অন্তরঙ্গ বন্ধু ও কবি ভাস্কর চক্রবর্তী লিখেছেন "শামশেরের সঙ্গে বন্ধুত্বটা ছিল একটা বাঘের সঙ্গে বন্ধুত্বের মতো। এতটাই উদ্দাম, সজীবতা, দুসাহসিকতা ছিল শামশেরের–এতটাই আক্রমণাত্মক, বিষণ্ন আর ক্ষুব্ধ—এতটাই আন্তরিক ছিল শামশের—এতটাই আন্তরিক যে প্রকৃত শামশেরকে খুঁজে পাওয়াই ছিল মুশকিল।...মা আর প্রেমিকার এক মিশ্রিত বন্ধনে শামশের এক দীর্ঘ সময় আচ্ছন্ন ছিল।...সত্তরের এই মহাসময়ে তাঁর জীবন ছিল যেমন বেপরোয়া, তাঁর কবিতাও তেমনি। এমন সশস্ত্র এত আধুনিক কবি, সত্যিই খুঁজে পাওয়া ভার।

শামশেরকে পড়ার সময় তাঁর কবিতার পেছনে নড়ে ওঠে আর এক কবির ছায়া। দেড়শ বছর আগে যিনি লিখেছিলেন–

এবং যখন মায়েরা আর্ত চিৎকারে তার পায়ে মাথা ঠুকে
পুরোনো চাদরটিতে ঈশ্বরের মুখ ঢেকে যায়,
কান্নায় দাগ মুছে ফেলে
রুমালের গিঁট খুলে একটা স্বর্ণমুদ্রা মেলে ধরলেই
ঈশ্বর জেগে ওঠেন।
(অশুভ সময়/ র‍্যাবোঁ)

যেভাবে শামশের লিখেছেন–

এখানে, এই পাশবিক গর্তের ভিতর আমি ঘুমিয়ে থাকি
নিজের থাবা, গায়ের উঁকুন এবং থাবার ভেতর
লুকোনো প্রতিটি নখ ভালোবেসে।
দিনরাত্রি আমি পাহারা দিই নিজেকে।
(পাশবিক)

অথবা

যে রাত একান্ত তোমার

কবি গান গায়—যে ভাবে তুমি সূক্ষ্ম কারুকাজে
সুন্দরতম করে তুলেছিলে ঢেউ খেলানো ওড়নাটিকে
সুন্দরী পদ্ম আফেলিয়া ভাসছে সেখানে, যেন নক্ষত্রের নীচে
ঐ দেখ ভেসে যায় পবিত্র পদ্মফুল নদীর মত দীর্ঘ ওড়নায় শুয়ে
(আফেলিয়া/ র‍্যাবোঁ)

শামশের লেখেন—

আত্মজ্ঞানহীন ঘুমে গড়াই আমি—
বেশ কিছু মৃত পাখি ডানা মেলে রোদ পোহায়
লাল নদীর ধারে
(সেই লাল নদী)

র‍্যাবোঁর কবিতাংশ—

ফলের গন্ধ ও টের পাচ্ছে না; বুকের ওপর এলিয়ে পড়া দুহাত
রোদে শুয়ে আছে নিথর, নিশ্চুপ।
ওর দেহের ডান দিকে দুটো লাল ছিদ্র, গুলির চিহ্ন
(Le Dormeur Du Val)

অথবা

আর আমার কপালে টুপটাপ ঝরে পড়ে শিউলি শিশির কণা
যখন আমার ছেড়া চটির শব্দও বীণার তারের মত
সপ্তসুরে বেজে ওঠে, বুকের ওপর শুধু চেপে বসে
ঠান্ডা ও ভারী একটা পা
(Mae Bohime)

দু শতকের দু প্রান্তে বসে দুই কবি সত্তার গভীরে পৌঁছে যান মৌল মানবতা থেকে ভ্রষ্ট হওয়ার যন্ত্রণায়। র‍্যাবোঁর মতই শামশের লেখেন—

হাজার হাজার বন্দী মানুষের সঙ্গে আমরা বেঁচে রয়েছি বন্দী হয়ে
বুকের ওপর কবর এবং পিঠের নিচে মাটি অথবা বুকের ওপর
(মূঢ়, ভুল প্রার্থনা)

বা

আমার হাড়ের ভিতর ঢুকে পড়ছে শীত, নিষ্ফলা শীত:
...আমি স্পর্শ করলে বাস্তবতা
ভেঙে চুরমার হয়ে যায়, বৃষ্টির গুঁড়োর মতো ছায়ার গুঁড়োর
ভিতরে কেন আমি বেঁচে থাকি জগতের অপ্রিয়?
(আর কেউ)

শামশের প্রথম কবিতার বই *মা কিংবা প্রেমিকা স্মরণে* (১৯৭৩)। পশ্চিমবঙ্গে তখন আধা ফ্যাসিস্ট বর্বরতার সময়। স্বাভাবিকভাবেই কবিরও ভাষা ও প্রতীকে এসেছে সেই সময়ের গ্লানি। শামশেরও পাঠকৃতিতে সে সময় রয়ে যায় ছিন্নবিচ্ছিন্ন জীবনের দহন চিত্র। নিষ্ঠুর পীড়নের জাল ছড়িয়ে দিয়ে যে সামাজিক শক্তি দুর্বার, তার প্রতিপত্তির কাছে নাগরিক জীবনের ঘেরাটোপে অভ্যস্ত কবি এখানে তার বন্ধ্যাত্বই অনুভব করেন শুধু। উত্তরণের কোনো উচ্চারণ সেখানে থাকে নি। এর দীর্ঘদিন পরে বের হয় দ্বিতীয় বই *মূর্খ স্বপ্নের গান*। এখানে কবি সেই চক্রব্যূহকে ভাঙতে চেয়েছেন যা তার সময়কে আষ্টেপিষ্ঠে বেঁধে ফেলেছে। তাঁর আর্ত প্রার্থনা 'বন্দীত্ব থেকে মুক্তি আমাদের লোহার শৃঙ্খল জড়িয়ে যাচ্ছে আমাদের খুলির ভেতর।' শেষ কবিতার বইয়ে (*শেকল আমার গায়ের গন্ধে* ১৯৯১) যেন এই শেকলের শব্দ অনেক প্রবল। এ সময় বাস্তব আরও নিরালম্বও ও বিভ্রমময় হয়ে উঠেছে শামশেরের কাছে; যেন পঙ্কিল আবর্তে নিমজ্জিত কবি একে অনিবার্য বুঝতে পেরে ক্রমাগত আত্মপীড়নের পথে হাঁটতে থাকেন—

অস্থির প্রাগল্‌ভ কাকাতুয়া খোলা শার্টের ভিতর
অকস্মাৎ নেমে আসে।
কালো দগ্ধ হৃৎপিন্ড ঠোটে নিয়ে সে আবার উড়ে যায়'
স্বৈরিণী আকাশে
(এখানে)

শামশের তাঁর থেকে বয়সে কিছুটা অগ্রজ শক্তি, সুনীলের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ ছিলেন। শামশেরের মৃত্যুর পর তাঁর স্ত্রী নাজনিনের উদ্যোগে বের হয়েছিল তাঁর আলোচনা গ্রন্থ: *রক্তকরবীর* দুই সংকলনে প্রকাশিত প্রবন্ধের সংকলন *শক্তি ও তাঁর পরবর্তী কবিরা*–এর মুখবন্ধ লিখতে গিয়ে আয়ান রশীদ খান লিখেছেন: শামশের সবার বন্ধু ছিল। এখনও আছে। অধঃপতনে আমার শুধু একজন প্রতীক ছিল, সেটা ছিল শামশের, পরে জানলাম যে ওর অধঃপতনটা আমার চেয়ে একশোগুণে বেশী সত্য। গালিব ১৮৫৮ সালে লিখেছিলেন—"সামালনে দে মুঝে অ্যায়নাও ওমেদী কিয়া কায়ামত হ্যায় কে আব দামানে খায়ালে ইয়াদে ইয়ার ছুটা যায়ে হ্যায় মুঝছে"। অনুবাদ "থামাতে দে এই হতাশা একি ব্যভিচার, যাকে আমি প্রথম ভাবি তারও চিন্তা নেই।" আমরা সবই যারা এই বন্ধুর আশেপাশে ছিলাম তারা কখনো কখনো নিশ্চয়ই পেরিয়েছি কিংবা আভাস

পেয়েছি।...শামশের হোসেন মিয়ার মত আমাদের সেই ময়নাদ্বীপে বারে বারে নিয়ে যাবার চেষ্টা করেছিল যেখানে সে আমাদের আগে লুই বার্জেসকে নিয়ে গেছে, রিলকেকে নিয়ে গেছ।...আমার মনে হয় শক্তি ইচ্ছাকৃত অথবা অনিচ্ছাকৃতভাবে এখন ময়নাদ্বীপে আছে।" এই গ্রন্থেই শামশের শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের সনেট প্রসঙ্গে শক্তির নিম্নোক্ত সনেটটি উদ্ধৃত করেছেন—

আমার বিশ্বাস, আমি একা থাকবো—উত্তরাধিকৃত
কিছুতে হবো না ছার কবিতার কিংবা ছা-বালকে!

"তাঁর ঐ ছত্র দুটিতে শক্তির প্যারানাইড ধৃষ্টতার পরিচয়ও পাওয়া যায়। এবং লিখেছেন, ...ক্ষীণ হলেও স্বতন্ত্র একটি নমুনা হিসাবে যা ইতিমধ্যে উপস্থিত, চরম দাম্ভিকতায় শক্তি তাকে অগ্রাহ্য ও অস্বীকার করে হয়তো নিজের জন্য সেই পিচ্ছিল জমি তৈরি করেছিলেন যা তাঁর পতনের অন্তত আংশিক কারণ। ...সনাতন এবং আধুনিক অনেক কবি নিজের কবিতার বিবর্তনের জন্য উত্তরসূরিদের কবিতার ধারা—তা ক্ষীণ বা কল্লোলিত যাই হোক না কেন, অনুধাবনের চেষ্টা করেছেন।" এই ভাষ্যর মধ্য দিয়ে আমরা শামশেররও 'পতন' বা 'উত্তরণ' বিষয়ক একটা অন্য ভাষ্যর খোঁজ পাই না কি? *রক্তকরবী*তেই শামশেরের লেখা 'যুক্তির প্রহরি' সে সময় শোরগোল তুলেছিল। এটিও গ্রন্থাকারে প্রকাশের গুরুত্ব দাবি করে।

শামশের একদিন কথাপ্রসঙ্গে বলেছিলেন 'একজন কবির কবিতা লেখা উচিৎ তাঁর নিজস্ব ক্রিস্টালয়ের কেন্দ্র থেকে।' শ্যামল সিংহের স্মৃতিচারণে পাচ্ছি "শামশের বলছেন: 'একজন খুনীর সাথে একজন কবির এক জায়গায় সূক্ষ্ম মিল আছে।' আসলে, খুনীর মতো রাগ না থাকলে কবিতার টুটি চিপে ধরা যায় না।" আসলে তিনি জীবনের অবমূল্যায়নের বিরুদ্ধে তাঁর অর্ধোচ্চারিত প্রতিবাদ হিসেবে কবিতাকে উপস্থাপিত করেছেন; অন্ধকারকে চিনেছেন, উপলব্ধি করেছেন নরককে। শামশের জন্মেছিলেন নবাব বংশের রক্ত নিয়ে, অভিজাততন্ত্র ও সামন্ততান্ত্রিক পরিবেশের অন্দর-বাহির নিকট থেকে দেখেছেন। সমকালীন মুসলিম সমাজের অন্যতম জ্ঞানচর্চার কেন্দ্র ছিল তাদের পরিবার। আবার বনেদি রক্ষণশীলতার গন্ডি কাটা ছিল কঠিন অনুশাসনে। মা ছিলেন ৫০-এর পূর্বের কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এম.এ এবং মহিলা হিসাবে প্রথম দিকের ফার্স্টক্লাস, বাংলায়, খগেন্দ্রনাথ মিত্রর এই প্রিয় ছাত্রী সাংসারিক জীবনের অবরুদ্ধ অবস্থা কাটিয়ে উঠতে পারেন নি। শামশের এই মাকে দেখেছেন, শিখেছেন, যন্ত্রণাও পেয়েছেন। শামশেরের একান্ত আশ্রয় ছিলেন তাঁর নানি, নানির মৃত্যু তাঁকে একটা ধাক্কা দিয়েছিল। তাঁর মামা ছিলেন বশির আল হেলাল, বাংলাদেশের বাংলা একাডেমির প্রধান হয়েছিলেন, গোটা পৃথিবী ঘুরেছেন। ভঙ্গুর সামন্ততন্ত্রের জীর্ণ কাঠামোর ভেতরের আর্তনাদ তিনি শুনতেন প্রতিনিয়ত। এই অস্থিরতার থেকেই জন্ম নিয়েছিল তাঁর চূড়ান্ত পরিণতি। একবার জলপাইগুড়ি ইউরোপিয়ান ক্লাবে কথাচ্ছলে বলেছিলেন—লোরকার duende-র কথা। সার্ত্রের উপদেশ শুনিয়েছিলেন "অযথা চিৎকার করে, অন্যকে বিরক্ত না করে চুপচাপ থাকাই উচিৎ।" ক্রমশ নিজেও চুপচাপ হয়ে যাচ্ছিলেন যেন। ডি.বি.সি রোডের মুর্শিদাবাদ হাইসের লনে বসে শ্যামল, বিজয়, সমর ও আমি, মধ্যখানে বেতের চেয়ারে শামশের। মৃত্যু প্রসঙ্গ এলো, শামশের বললেন, 'আমার পছন্দ, সাদা ছটফটে বিছানায় শুয়ে মুঠো মুঠো স্লিপিং পিল খেয়ে, ধীরে ধীরে মৃত্যু উপভোগ করতে করতে নিঃশব্দে চলে যাবো।' শামশের এভাবেই 'পোয়েটিক মৃত্যু'কে বেছে নিলেন। ১৯৯৩-এর ১২ জুন। তাঁর একটি আধুনিক ঘটনা'র ভাষায়—

আলো, ঊষার গা থেকে কাপড় খুলে নিলে
আমার আত্মার রঙ হবে চেতনাহীন। বিবস্ত্র সাদা
আর তা মিশে যাবে দিনের ধবধবে আলোয়
যেমন মিশে যাবে অন্য সব।

অন্যসব কিছু মিশে যায়, মিশে গেছে, রয়ে গেছে শুধু এক অশান্ত, অতৃপ্ত যন্ত্রণাকাতর কবির কিছু অমোঘ উচ্চারণ। যোগব্রত চক্রবর্তীর মৃত্যুর এলিজি লিখেছেন শামশের—

শুধু মাঝে মাঝে ইস্পাতের দেহে ছোটাছুটি,
ভ্রমণ থামিয়ে এক উদ্‌ভ্রান্ত
চিৎকার ধাওয়া করে আমাদের—'এ ভুল ঘোড়ার সওয়ার'।
আমরা পালাই, মূঢ় ও সচ্ছল ইস্পাতের থেকে
ছুটে যাই আরো মূঢ় ও নির্বোধ ইস্পাতে'।

শামশেরের নাতিদীর্ঘ জীবনের অধিকাংশটা জুড়েই ছুটে চলা, থামলেন হঠাৎ-ই। আমাদের চুপ করিয়ে দিয়ে।

শামশের তাঁর *শক্তি ও তাঁর পরবর্তী কবিরায়* আলোচনা শেষ করেছেন এভাবে—"দান্তের Paradiso xxx 133 B8-এই অধ্যায়ে দান্তে আমাদের একটি আসনের মুখোমুখি টেনে আনেন। আসনের ঠিক মাঝখানে একটি মুকুট পড়ে রয়েছে। মুকুট অপেক্ষা করে আছে যোগ্য ব্যক্তিটির জন্য যে তাকে শিরে ধারণ করে তাঁর অহংকার, তাঁর শোভা বাড়াতে পারবে। স্নায়ুপীড়নকারী অধৈর্য নিয়ে মুকুট আসনে একাকী পরে আছে কারুর শিরস্ত্রাণ হবার জন্য। জীবনানন্দ দাশ সেই যে ট্রামে চাপা পড়ে মারা গেলেন,

তারপর থেকেই বাঙলা কাব্যসাহিত্যের উন্মুক্ত একটি আসনে ঐ কিরীট অধৈর্য এবং আরো অধৈর্য হয়ে কেবল অপেক্ষাই করে আছে।" শামশের, অনন্য, তুষার, শ্যামল—এই হঠাৎ হঠাৎ 'প্যাকআপ' রঙ্গামঞ্চের শূন্যতাকে ক্রমশঃ দীর্ঘস্থায়ী করেই চলেছে। সবশেষে তাই শামশেরেরই ভাষায় বলতে হয়—

অশুময় চিৎকারে ডাকি: কেন গেলে, এই
উন্মাদ, তোমাদের দ্বারা নষ্ট পাখিকে কে প্রশ্রয় দেবে আজ?
বৎসরান্তে কে দেবে আমায় সস্নেহ, ঝোল মাখানো খুকি?
কার দীর্ঘ শ্বাস টের পাব এই পুড়ে যাওয়া, ব্যর্থ অস্তিত্বের আধো জড়িত ঘুমে।

একটি গান পাতা ঝরাতে ঝরাতে ফুরিয়ে গেলে নদীর জন্ম

চালসাটিলা

তখন এপ্রিল, গরম ক্রমশ বাড়ছে। আমদের প্রথম যৌথ ভ্রমণ। ময়নাগুড়ির বিশুদার প্রেস থেকে *ক্রুশেড* ছাড়া হাত, এখানেই বিজয় দে–র প্রথম কবিতার বই *হে থুতু হে ডাকটিকিট হে অরণ্য* ছাপা হয়। এই ময়নাগুড়ির থেকেই উত্তরের জাতীয় সড়ক ধরে আমদের প্রথম যৌথ অরণ্য ভ্রমণ। জলপাই স্যাংচ্যুয়ারির বিজয় দে সমর রায়চৌধুরী, শ্যামল সিংহ, সঙ্গী আমি আর এই অরণ্য ক্যাম্পের ক'দিনের অতিথি রণজিৎ দাশ। ধুপঝেড়া, নাগরাকাটার পথে, মুর্তিনদীর ধারে বেশ কিছুক্ষণ। এর আগে ছিল সহস্রবছরের প্রাচীন জটিলেশ্বর মন্দির ও জলপেশ মন্দির আর জলঢাকা নদীর পাশে সেচ বাংলো। ঐ রাতে চালসাটিলার ডাকবাংলোয়। চালসার চাঁদ সাক্ষী ছিল এক উদ্দাম আড্ডার, নানা রঙের কবিতার জন্ম হওয়ার। শ্যামল সিংহ এই আড্ডায় যেন নিজেকে খুলে মেলে ধরেছিলেন অনেকটা। নানা যন্ত্রণা ও অপ্রাপ্তির ছোট ছোট ক্ষত ডেকে থাকা সবুজ এক মর সেখানে দরাজ গলায় গান গায়। উন্মুক্ত শ্যামল সে রাতের প্রথম প্রহরে চালসাটিলা থেকে গেয়েছিলেন একের পর এক গান, তাঁর আশ্রয়ের রবীন্দ্রগান। মেটেলির পথে, উপর থেকে নীচের মূর্তি নদীকে, অরণ্যকে যেমন দেখায়, পাহাড় পাথরকে যেমন রূপবান দেখায়, শ্যামলদা যেন হঠাৎ তেমনি মনে হয় হয়ে যান আমার স্মৃতিতে। ঐ রাত 'এক অনন্ত মধ্যরাত' হয়ে নেমে আসে, যেমন সেদিনও এসেছিল হয়ত। রাতের ২য় প্রহরে আমরা একে অন্যের থেকে পৃথক কবিতার সঙ্গে সহবাসের জন্য। পরদিন সকালে সদ্যোজাত কবিতাগুলোকে, একসঙ্গে থাকার প্রতিটি মুহূর্ত আজও স্মৃতির ঐ ধূসর রাতের

মত আসে। অবশ্যম্ভাবিভাবে শ্যামলদাকেও দেখতে পাই সেখানে, রণজিৎদারও বেশ কয়েকটি কবিতার জন্ম প্রক্রিয়া শুরু এই সময়।

চালসা পাহাড়ের মাথায় উঠেছে চাঁদ–
রাত্রির জরায়ু থেকে ছিটকে–ওঠে এক ফৌজি হাউই
কোড–নেম পূর্ণিমা, যার আলোয়
গেরিলাদের রক্তচিহ্ন লক্ষ্য রাখছে কুট নক্ষত্রেরা
আমার জ্যোৎস্নার ভয়ে গুড়ি মেরে বসে আছি
শালগাছের আড়ালে, জিনেদের ক্যাসেট, মদ, তোয়ালে ও চাকু
পাথরের নীচে লুকিয়ে রেখেত
কবেকার ভুলে যাওয়া যুদ্ধবন্দীদের মতো...
(চালসা কিংবা বার্লিন)

জীবনানন্দ সরণি

ঐ রাস্তাটিকে জীবনানন্দ সরণি বলতে চাই আমরা, এভাবে অনেকদিন আমরা স্টেট ব্যাংক–এর সামনে দিয়ে কিংসাহেবের ঘাটের দিকে যেতে যেতে ব্যক্ত করতাম এই সুপ্ত–গুপ্ত ইচ্ছেটাকে। জীবনানন্দর জলপাইগুড়ি আসার ইচ্ছে পূর্ণ হয় নি। ''শিরীষ গাছের দীর্ঘ ছায়া'' মাখা দিঘির জলপাইগুড়ি তিনি দেখে যেতে পারেন নি। অনেক অপূর্ণ ইচ্ছের মত আমাদেরও এইসব ইচ্ছেরা হারিয়ে যায়। ঐ জীবনানন্দের নামে চিহ্নিত না হওয়া রাস্তার পাশেই এক সরকারি বাংলোয় শ্যামল সিংহসহ শেষ আড্ডা আমাদের। ভালোপাহাড়ের বারীণ ঘোষাল, সঙ্গে রঞ্জন মৈত্র, স্বপন রায়রা কবিতার ট্রেনিং পথে এসে থেমেছিলেন একরাত। গত দুবছরে একরাত শ্যামল সিংহসহ জলপাইগুড়িতে, অজস্ররাত শ্যামলহীন জলপাইগুড়িতে। যে সন্ধ্যায় শ্যামলদা ছিলেন, সে রাত ধুয়ে গিয়েছিল অনন্ত 'সঙ্গীত সুধা রসে'। শ্যামলদা একের পর এক রবীন্দ্রগান গেয়ে যাচ্ছিলেন। ঐ চোখের সামনে ভেসে ওঠে সন্ধ্যা, চোখ বুঁজে দরাজ গলায় গাইছেন শ্যামলদা ''আকাশ ভরা সূর্য তারা বিশ্বহারা প্রাণ তাহারই মাঝখানে....''। দেবব্রত বিশ্বাস, নীলিমা সেন ছিল তাঁর পছন্দের প্রিয় গায়ক। গানের কোনো প্রথাগত তালিম ছাড়াই দেবব্রত বিশ্বাসের ভঙ্গিতে গাইতেন তিনি। গত ১৪ ই ফেব্রুয়ারি' ০৩ শ্যামলদার বাড়ি গিয়েছিলাম, তুরি বৌদি শ্যামলদার গাওয়া কয়েকটি রবীন্দ্রগান ক্যাসেটবন্দী অবস্থায় সংগ্রহ করেছেন। বৌদি তা শোনাতে চাইলেন কিন্তু আমার ভীষণ ভয় হল, শোনার সাহস পাই নি, শ্যামলহীন যে শূন্যতা–সেখানে তাকালে আজও বড় অসহায় লাগে।

আমার অধিকাংশ কবিতার প্রথম পাঠক শ্যামলদা, সেই শ্যামলদার সাথে মাঝে মাঝে বেশ কিছুদিন দেখা হত না। কর্মব্যস্ততার জন্য অনেকদিনই বিকেলের কদমতলার আড্ডায় যাওয়া হত না, বিজয়দাও আসতে পারছিলেন না। সমরদা ও শ্যামলদা প্রায় নিয়মিতই আসতেন। এভাবেই ধীরে ধীরে দুদশক অতিক্রান্ত আড্ডাটা ভেঙে যাচ্ছিল। কয়েকদিন পরে পরে যখনই শ্যামলদার সঙ্গে দেখা হত, একরাশ অভিমান তার মুখে দেখতে পেতাম। আড্ডাটা শেষমেষ রবিবার সকালে, সপ্তাহে একদিনেএ এসে দাঁড়িয়েছিল। আড্ডার এই পরিণতির যন্ত্রণা সমরদার মতো শ্যামলদার মধ্যে টের পেতাম। মৃত্যুর আগে বেশ কয়েকবার সাইকেল দুর্ঘটনা ঘটেছিল সেই যন্ত্রণা তাকে বেশ কাবু করেছিল। বুকের একটা দিক ও কাঁধে ব্যথা ছিলো। নিকটজন বন্ধুদের থেকে দুরত্ব তাঁকে কেমন যেন শিশুর মত যন্ত্রণাকাতর করে তুলত। তাঁর এই ব্যথাগুলো যে একে একে জমছিল। ঐ বছর ফ্রেব্রুয়ারির প্রথম সপ্তাহে প্রবল বৃষ্টি হয়, সঙ্গে জমিয়ে ঠান্ডা পড়েছিল জলপাইগুড়িতে। অসুস্থ শ্যামলদা কর্যত গৃহবন্দী হয়ে যান কয়েকদিন।

লাল শাক দিয়ে মাখা ভাত

শ্যামল সিংহর প্রথম কবিতার বই *চাঁদ ও খোঁড়া বেলুনওয়ালা*। ১৯৮২ থেকে ১৯৯০, নবছরে লেখা কবিতার সংকলন। কবিতাগুলো কবিতার কুয়াশা থেকে দুরে থাকে রচিত, যেখানে কবিতার জন্য কোন মঞ্চ নেই, কোনো এলিট শ্রোতা নেই, হাততালি নেই।

পাখিকে আড়াল করে
লোকটি লিখছে
জুতোর শেষ প্রান্তে পড়ে আছে মাঠ

শ্যামলের কবিতা পড়ে শোনানোর জন্য নয়, আবৃত্তিরও নয়, এক এক ছোট চিত্রকল্পের সামনে থমকে দাঁড়ানো। খুব ছোট ছোট, এক একটি চিত্রকল্প সেখানে অমোঘ, অব্যর্থ। শ্যামল সিংহের জীবন ভাবনাও তাঁর কবিতার মতো। তাঁর নিজস্ব ভাষায়—

জীবনের প্রথমত
লাল শাক দিয়ে মাখা ভাত যেদিন প্রথম লাল হলো,
সেই রঙ্গের ভাত

শ্যামল সিংহ সম্পর্কে তাঁর সঙ্গী কবি বিজয় দে লিখেছেন—সত্তরের লিটল ম্যাগজিন আন্দোলন, প্রতিষ্ঠাতা বিরোধিতার বজ্রনির্ঘোষ, বিভিন্ন সাহিত্য মতবাদের তুমুল চর্চা এবং

বামপন্থার বহুমাত্রিক বিস্ফোরণ... ইত্যাদির পরিপ্রেক্ষিতে যে বারুদগন্ধী আবহাওয়া তৈরি হয়েছিলো, তাতে শহারের অনেক মহারথীরই শ্বাসকষ্ট শুরু হয়েছিল, এরকম শুনেছি। এরসমও শুনেছি, ''এদের আঁতুড়ে নুন খাইয়ে মেরে ফেলা উচিৎ'' এই বজ্জাত চিন্তাধারা তখন শহরের আকাশে বাতাসে। যদিও এই হাওয়া থিতানোর অনেক আগেই, শ্যামল হয়ে উঠলেন প্রকৃত শ্যামল। আলাদা ভাষা, আলাদা ভাবনা, আলাদা ভুবন—

শুধু কান্নাটুকু রেখো
বাকি সব পাকতে দাও
কেউ কেউ বৃষ্টি নিয়ে
প্রতিদিন বাড়ি ফেরে
সেতুর কথায় ফিরে আসি
সেতুর তলায় মেঘের মতো জমা হচ্ছে সুখ
...
শুধু কান্নাটুকু রেখো
বাকি সব পাকতে দাও

শ্যামলের কবিতা যতিচিহ্নের তোয়াক্কা করতো না, দু–তিনটি শব্দের পরে যে শব্দগুলো সচেতনভাবে তিনি জুড়তেন তা নিজেই যতির খোঁজ করে নিত—

বিশ্রাম কি
বাঘ পুড়ছে
বিশ্রাম কি
ঘোড়া পুড়ছে
হাতের মুঠোর ভিতরে খাঁ খাঁ করছে
বাগান
এখনও রক্তের দাগ স্পষ্ট

আবার যখন ব্যবহার করতেন, তা অনিবার্যভাবেই বিশেষ ভূমিকা নিতো—

ব্যাঙ ডাকছে। বৃষ্টি পড়ছে
যুবতীর পেটের ভেতর বসে
আমি শুষে নিচ্ছি ব্লটিং পেপারের দুঃস্বপ্নগুলি

ব্যাঙ ডাকা আর বৃষ্টি পড়ার মধ্যে যতি, এর পরের লাইনের মাঝে এক লাইন শূন্যতা। এই নির্মাণ কবিতায় সৃষ্ট আবহের প্রয়োজনেই।

শ্যামলের কবিতা তিন/চার লাইনেই বিস্ফোরণ ঘটাতে সক্ষম, তাই বেশি শব্দ বা বাক্যর প্রয়োজন অনুভব করেন নি। কবিতা লিখতেন স্মৃতিতে। তারপর অবসর মত কখনও বন্ধুরা কখনও তুলি বৌদি, আবার কখনও নিজেই লিখে রাখতেন। সাধারণত ফুলস্কেপ সাদা কাগজে। কেউ কেউ শ্যামল সিংহের কবিতাকে জাপানি হাইকুর সঙ্গে বা বাংলার সংহত কবিতা' কবিতা র সঙ্গে একানে বসাতে চান। এ নিয়ে তার প্রবল আপত্তি ছিল। হাইকুর মধ্যে যে ঐতিহ্য ও কাব্যিক সুষমা থাকে তা অস্বীকার করে এক প্রতি কবিতায় শিখরে আরোহণ করা শ্যামল সিংহের কবিতা।

হাদের নীতে সাপ
তুমি প্রবাসী হলে
আড়াল থেকে ফুঁ দিলে
সমুদ্রে বড় ওঠে
মাটিতে আলোর খোঁজ শেষ হয় না।

অথবা

উঁচুতে ডিম
নীচে ভরাট সংসার
মাঝে মাঝে নদী বেড়াতে আসে

প্রথমটির প্রথম দুলাইনের পর একটা শুন্যতা, তারপর আবার দুলাইন পর একটা শুন্যতা, এর ব্যবহারে শ্যামল পাঠককে ভাবার সুযোগ দিচ্ছেন, নিজের মতো, প্রচুর 'অবসর' থাকছে পাঠকের সমান। এভাবেই মাত্র তিন লাইনের কবিতাটিরও শেষ লাইনের আগে এক লাইন পজ বা শূন্যতা এক অনাক্ষরিক লাইন। কোন রহস্যময়তা নয়, কাব্যিক ইমেজ নয়, নিপাট ভাবার খোরাক, নাটকীয় মুহূর্ত পাঠক ভাবতেও পারেন, নাও পারেন। কবিতায় অযথা উপমা, বাক্যালংকার আবেগের প্যানপ্যানানির বিরুদ্ধে এক মেদহীন পুরুষের হুংকার তাই যেন কয়েকটি শব্দই যথেষ্ট। আধুনিক উত্তরাধুনিক প্রভৃতি কাণ্ডে ও ছিলেন না তিনি। উন্মাদের মত তিনি নিজের খেয়াল মত শব্দ নিয়ে খেলতেন। কোন তোয়াক্কা না করে। এই বাংলা কবিতার প্রধানতম প্রতি কবিতার নিদর্শন তার কবিতা।

টেবিলের ওপর জ্বল জ্বল করছে টমেটো
তুমি কি বিবাহিত?
টেবিরের ওপর জ্বলজ্বল করছে টমেটো
তুমি কি বিবাহিত?

একটা জিজ্ঞাসা, দুবার কিন্নতু একটা ভাবনার সূচনা মাঝখানের ফাঁকা জায়গাটার দুপাশে একই লাইন। চোখের সামনে জ্বলজলে করে ওঠে টমেটো যুক্ত হয় বিবাহ অনুষজ্ঞা। ফটোগ্রাফিক কায়দায় তিনি আনেন কল্পনার জুম, কিন্নতু ফোকাস পড়ছে বিবাহ সম্পর্কে। বাংলা কবিতার পাঠকদের সামনে একটা নতুন সুরজ্ঞামুখ খুলেছিলেন শ্যামল, যেভাবে বাংলা কবিতা এর আগে লেখা হয় নি। সুরজ্ঞের রহস্যময় অনিশ্চয়তার ওপারে নতুন আলোর ছটা। ছোট কবিতা বা সংহত কবিতার মতো নয় এই কবিতা, শ্যামলের কবিতা সুবেশ আবৃত্তিকারের জন্য নয়, তাঁর কবিতা বিজ্ঞাপনে ব্যবহার করার জন্য নয়। তাঁর কবিতা গবেষক/ অধ্যাপকদের ছাত্রপাঠ্য ব্যখ্যাযোগ্য নয়। এই কবিতা পাঠকের মগজে ঢুকে পড়ে নিঃশব্দে দু–তিনটি লাইন পাঠের পরেই। এরপর শুরু হয় শব্দের নীরব প্রতিক্রিয়া, দীর্ঘস্থায়ী থাকে তার প্রকোপ। অনেক কবিতা তাই দুই–তিন লাইন পড়ার পর পাঠক তাঁর অভ্যাসজাত ভাবেই কল্পনার কাঠামো তৈরি করে ফেলেন, কিন্নতু শেষের এক দু লাইনে শ্যামল পাঠকের অভ্যাস মতো নির্মানকে ভেঙে চুরমার করে দেন।

দুধের নীচে
তোমার নাম লিখো
চুল আছে বনে
প্রতিদিন একটু একটু করে এগিয়ে আসছে
হারমোনিয়াম
নদীতে জল বাড়ছে

বা

রোদে রোদে গড়ে উঠছে তামাশা
হাওয়া টপকে নেমে পড়ে
জল্লাদ
রক্ত ছিটকে পড়ে আয়নায়
সারারাত গড়িয়ে যায় উল
সারারাত গড়িয়ে যায় উল

এই শেষ কবিতাটিটি প্রতিটি লাইনে একটা বর্ণনা থাকলেও কবিতাটি বর্ণনা নির্ভর নয়। একটা গতিতে বর্ণনাকে মুছে ফেলে একটি ভাবনা ভেসে থাকে, এটাই শ্যামলের স্টাইল। শ্যালের কবিতা ভীষণভাবে রাজনৈতিক, কিন্নতু এ শ্লোগন বা বক্তব্য নির্ভর ‘রাজনৈতিক কবিতা’ নয়।

কানের পাশে মেঘ ডাকছে
লবণের কাছে ঋণী আছি
মনে পড়ছে
স্লেটের ওপারে আত্মীয়স্বজনের কথা
আমার দিকে
লোকটির পা থেকে ছড়িয়ে পড়ছে
পোড়োবাড়ির গন্ধ
(পোড়োবাড়ি)

বা

কোন কথা বলি নি/ বৃষ্টির আগে
কোনো কথা বলি নি/ বৃষ্টির পরে
কলমের ঘুম থেকে বেরিয়ে এসে
আমি আগুনের কাছে পাঠ নিচ্ছি
যাবতীয় মন্ত্রের
পাঠের ফাঁকে ফাঁকে
আমি হাত বুরিয়ে যাচ্ছি
আকাশে তারাগুলি

শ্যামল তাঁর কবিতার প্রতি নিজেকে উৎসর্গ করে দিয়েছিলেন। ফলত বাইরের বস্নতুবিশ্বের দৈনন্দিন যোগবিয়োগে তাঁর উৎসাহ আগ্রহ কমে যাচ্ছিল। কবিতার যে স্বসৃষ্ট ‘অ্যাটিচ্যুড’ তাঁর সামনে ছিলো, তাই তাঁর নিভৃত সময়ের সাথী ছিল। এর ফলে কখনও কখনও কমিউনিকেশন’–এর ক্ষেত্রে একটা দুরত্ব তৈরি হয়ে যেতো। এই সবকিছুর প্রতিই উপেক্ষা ছিলো তাঁর অস্ত্র। উপহাস, অবহেলা, উপেক্ষা যত বাড়ছিল, শ্যামল ততই নিজেকে প্রস্নতুত করছিল। তিনটি কৃশ কবিতার বই তার চাক্ষুষ প্রমাণ। এটা একদিন থেকে শ্যামলের পক্ষে শুভই হয়েছিল। কেননা শ্যামল কবিতার যে অবিকল্প ভাষা নির্মাণ করেছেন, তা আগামি পঞ্চাশ বছরেও সাহিত্যের এই সব নকুড়মামাদের হাত দিয়ে বেরোবে না। এখানেই শ্যামলের জিৎ।

উল্লিখিত জীবনানন্দ সরণি না হয়ে ওঠে রাস্তার পাশের সরকারি বাংলোর সেই আড্ডায় বেশ কিছু নতুন ছেলে ছিল, যারা সম্প্রতি কবিতা চর্চা শুরু করছে, এদের লেখা প্রতিটি কবিতা খুব দারুণ আনন্দ পেতেন।এসময় নিভৃত আলাপেও সেই কবিতার প্রসজ্ঞা বারংবার আনতেন। কিন্নতু কবিতার উপরচালাকিতে হতাশও হতেন খুব, রাজধানী শহরের

কবিতা ব্যাপারীরা মফঃস্বলের তরুণদের জন্য ফাঁদ পেতে রাখেন, এবং এই ফাঁদে পড়ে অনেকেই অন্তঃভাবনাশূন্য এক চটকদার শব্দবিন্যাসের দিকে ঝুঁকে যায়। এতে অনেক সম্ভাবনার অকাল মৃত্যু ঘটেছে। এই বিষয়টি শ্যামল সিংহ সচেতনভাবে নজর রাখতে বলতেন, ''বিষের নাড়ু খাওয়ানো কলাকান্তার দাদা'দের থেকে সাবধান থাকার কথা বলতেন। বলতেন, এই প্রান্তবাংলাতেই কবিতায় নতুন ভাষা জন্ম নেবে। শ্যামলের কবিতা নতুন ভাষা ও ভাষ্যেরই জন্ম দিয়েছেন। শ্যামলের কবিতা প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল ১৯৭৫-এ। বিজয় দে বের করেন *পাগলাঘোড়া* এর প্রথম সংখ্যা জন্ম দেয় নতুন এক কবিকেও। এর ৭ বছর পরে ১৯৯১-তে প্রথম কবিতার বই *চাঁদ ও খোড়া বেলুনওয়ালা* ধূপগুড়ি থেকে ছাপা প্রচ্ছদ প্রকাশ কর্মকারের। এর দশ বছর পরে ২০০১-এ *সূর্যাস্ত আঁকা নিষেধ*, গৌহাটি থেকে বিকাশ ছেপে দেয়।

শ্যামল সিংহ, ছোট ছোট কবিতার লাইন, একটি বা দুটি লাইনেই অমোঘ বজ্রপাত থমকে দেবে পাঠককে। তাঁর কবিতার শুরুই যেন এক অন্য ভুবন থেকে, বাস্তবতার থেকে পরাবাস্তবতার দিকে এক সংক্ষিপ্ত উড়ান। ''আসলে শব্দের ভেতর দিয়ে শব্দের গভীরে যাতায়াত তার এক বাধ্যতা। চর্তুদিকের নানা ঝাঁকুনি ও দোলন থেকে তার কবিতার প্রতিক্রিয়া এরকম হওয়া ছাড়া আর কোন উপায় থাকে না। কারণ তিনি চান সেই পথ, পায়ের চিহ্ন না পড়া নতুন পথ।'' (সুশান্ত নিয়োগী)

শেক্সপীয়র ছিলো তাঁর অবলম্বন, 'হ্যামলেট' ছিল প্রিয় চরিত্র। তাঁর শেক্সপীয়র প্রেম সম্পর্কে রণজিৎ দাশ লিখেছেন— সে আমাকে দ্বিধাহীন স্বরে বলেছিল, 'বুঝলেন রণজিৎ কেউ যদি কবি হতে চায়, তা হলে তার পক্ষে নিবিড়ভাবে শেক্সপীয়র অধ্যয়নই যথেষ্ট।''

কবিতার টুটি

শ্যামলদার খুব কাছের কবি ছিলেন শামশের আনোয়ার। শেকলের শব্দে আক্রান্ত শামশের আকণ্ঠ ঘুমের বড়ি খেয়ে চির ঘুমে ঘুমিয়ে পড়েছেন। বিজয় দের লেখার সূত্রেই জানা যায় যে শামশের জানিয়েছিলেন তার প্রিয় কবির নাম শ্যামল সিংহ। শামশের যখন এ শহরে আসতেন তখন তার 'মুর্শিদাবাদ হাউসে' বেশ কয়েকবার আড্ডা হয়েছে, শেষ আড্ডা ঐ জীবনানন্দ সরণি না হওয়া রাস্তারই 'ইউরোপীয়ান ক্লাবে'র ঘরে। শামশেরের কবিতা নিয়ে শ্যামল সিংহ লিখেছেন ''শামশেরের কবিতাগুলো এতটাই রক্তমাংসে টগবগ করছে যে তার গনগনে আঁচ গায়ে এসে লাগে, মাঝে মাঝে কবিতাগুলো পড়তে ভয় হয়, কেমন যেন গা ছমছমে একটা পরিবেশ, কখনো কখনো শামশের কবিতাকে ভয় দেখাতো, বিপরীতভাবে কখনো কখনো কবিতাও শামশেরকে ভয় দেখা।'' *দ্যোতনায়* সেই লেখায় শ্যামল লিখেছিলেন—''একজন খুনীর সঙ্গে একজন কবির এক জায়গায় সুক্ষ্ম মিল আছে। আসলে খুনির মতো রাগ না থাকলে কবিতার টুটি চেপে ধরা যায় না।'' শ্যামলই যেন এভাবে খুনীর মত রাগে কবিতার টুটি চেপে ধরতেন—

রক্ত মাখো রক্ত
নইলে কিভাবে পৌঁছবে আকাশে?
আমাদের মাথা
ভেড়া অতিক্রম করে
রক্ত মাখো রক্ত
নইলে কিভাবে পৌঁছবে আকাশে

একক কবিতার পায়ে বজ্রবিদ্যুৎসহ বৃষ্টিপাত

২০৩-এর কলকাতা বইমেলায় শ্যামল সিংহ তাঁর তৃতীয় কবিতার বইসহ ঢুকতে চেয়েছিলেন। গত পুজো থেকেই চলছিল তার নির্মাণপর্ব। নামের খোলস পাল্টে পাল্টে অবশেষে *জেগে উঠছেন বাঘাযতিন* বের হল বইমেলায়, শেষের আগের দিন, শ্যামলদার আর যাওয়া হয় নি। একসঙ্গে তিনজনে বইমেলায় যাবো, গত পুজো থেকেই এই ভেবে বেশ উষ্ণ হয়ে উঠতাম আমরা। গত বইমেলায় শ্যামলদা একাই যান, হাত ছিলো *সূর্যাস্ত আঁকা নিষেধ*, সেবারও একসঙ্গে যাবো ভেবেছিলাম, হয় নি। এবারও তাই, আর হবে না এই নির্মম উপলব্ধি এখন অন্ধকারের মতো চারপাশে ধেয়ে আসছে। *জেগে উঠছেন বাঘাযতীন* ২ কপি হাতে পেয়েছিলেন, প্রচ্ছদ মোড়কহীন ঐ বই নিয়ে আমাদের শেষ আড্ডার দুপুরে শ্যামলদা বলেছিলেন, এবার হল না ভালই হল, আগামীবার যাবই, এ বই তখন নতুন থাকবে। ১৪ ই ফেব্রুয়ারি সকালে কবিতার বইগুলো শিলিগুড়ি এসে পৌঁছায়, প্রচ্ছদ মুড়ে আসা সেই বইগুলোর কথা শ্যামলদা জেনে যেতে পারেন নি।

১৯৭৭ কি ৭৮ হবে, ৫/৬ জন স্কুল পড়ুয়া কবিতাকে ভালোবেসে কবিতার উঠোন ও আকাশ খুঁজতে বের হই। সে সময়ই হাতে আসে *পাগলা ঘোড়া*, *ক্রুশেড* এই দমকা বাতাসে ঘোর কেটে যায়। গয়েরকাটা থেকে বিকাশ সরকারকে সঙ্গে নিয়ে চলে আসি ঐ বাতাসের উৎসে যেখানে ছিল নতুন ভাষা ও ভাবনার আলোক উদ্ভাস। প্রথমে সমর রায়চৌধুরী এবং তারপর বিজয় দে আর শ্যামল সিংহ। ক্রমে ক্রমে এক হয়ে যাওয়া। ভাবনার শরিক হয়ে যাওয়া। কবিতার, সাহিত্যের উঠোন ছেড়েও আমরা বন্ধু। গত ২৫ বছরের এই ভ্রমণে সহযাত্রী শ্যামল দা। বিজয়-সমর-শ্যামল তিনজনের থেকে বয়সে

ছোট হলেও অভিজ্ঞতায় পিছিয়ে থাকলেও ধরে হেঁটে যেতে অসুবিধা হয় নি, হঠাৎ হাত ফস্কে গেলো আজ। পায়ে পায়ে জড়িয়ে আছে অনেক ঘটনার কথা। তখন শুধু চিনি ওদের, রূপশ্রী হলের সামনে শামসের আনোয়ারের দাদুর বাড়ি, ঐ মুর্শিদাবাদ হাউসের দেওয়ালে কবিতা লেখার সিদ্ধান্ত হয়। অনুজের মত পাশে থেকে দেখেছি দেয়ালে ঐ কবিতার অক্ষর ধরে রাখার জন্য লড়াই। তারপর জলপাইগুড়িতে প্রথম বইমেলা, সাহিত্য সংস্কৃতির বাবুবাজির প্রাচীরের ধাক্কা খায় নতুন ভাষা–ভাবনা, আত্মসম্মানের অহঙ্কার নিয়ে বইমেলার বাইরে রাস্তার ধারে পত্রিকা বিছিয়ে বসে পড়া থেকে ১২৫ তম রবীন্দ্র জন্মদিবসের প্রতিবাদী মিছিলে মশাল হাতে শহর প্রদক্ষিণ, কণ্ঠে ছিল গান ''আগুন আমার ভাই, আমি তোমারই জয় গাই''। আরও কত স্মৃতি, কত কথা... রবীন্দ্রসঙ্গীত ভীষণ ভালো বাসতেন, গাইতেন। শ্যামলদার গান ছিল আড্ডার প্রাণ। টুকরো টুকরো ঘটনা চোখ বন্ধ করলেই ভেসে উঠছে আজ। মাথায় ক্রমশ ব্যাপ্ত হতে থাকা টাক, স্বল্প উচ্চতার এই মানুষটিকে এক পলকে দেখলে মনে হতো গম্ভীর এক রাশভারি রাগী, আসলে শিশুর মতো সরল। বিরাট হৃদয়ের মানুষ শ্যামলদাকে চেনা যেত কাছে এলে, বোঝা যেত তাঁর বুকের গভীর জলাশয়ে শীতল জল ও শালুক পদ্মা মৌমাছি মাছরাঙ্গারা কত নিশ্চিতে খেলছে। ভীষণ অভিমানী মানুষটার সবচেয়ে বড় অবলম্বন ছিল আত্মসম্মানবোধ। একবুক অভিমান, ছোট ছোট ইচ্ছে, একটাই স্বপ্ন ছিল, তাঁর কবিতা ও কবিতার মুক্ত আকাশ। ঐ মুক্ত আকাশ ভ্রমণ করতেন তিনি, সঙ্গী ছিল শব্দেরা, শব্দের সঙ্গে শব্দ জুড়ে থাকা ছোট ছোট কবিতার লাইন।

শ্যামল সিংহের ঠিকানা যে জগতের, জীবিকার জন্য তাকে আসতে হতো তাঁর বিপরীত চরিত্রের জগতে। এই ভিন্নতার দহনেও দগ্ধ হতেন তিনি। জলপাইগুড়ি পৌরসভার কর্মী ছিলেন, কয়েক মাস ধরেই আর্থিক দিক দিয়ে বিপন্ন পৌরসভার কর্মী শ্যামলদারও বেতন প্রায় হচ্ছিলই না।

এই তীব্র আর্থিক সঙ্কটের সঙ্গে যুঝতেন হাসি মুখে, পাশে যোগ্য সহযোগী ছিলেন স্ত্রী তুলি, স্ত্রীর মত প্রেমিকার মতো, বন্ধুর মতো। অথচ এমনটা হওয়ার কথা ছিল না, বাবা নলিনীরঞ্জন সিংহ শহরের প্রথমবারীর ব্যবসায়ী। ছয় ভাই দুই বোনের সংসার, বিপুল অর্থ বৈভবে মানুষ শ্যামল সারল্যে ও উদাসীনতায় ধীরে ধীরে দেখছেন কীভাবে ঐ বিপুল সম্পত্তি হাত বদল হয়ে গেছে, ক্রমে থেকে কেড়ে নিতে পারে নি কবিতার শব্দগুলো, রবীন্দ্র সঙ্গীত।

বিজয় দে, শ্যামল সিংহ। সূচনা হয়েছিল এবাবেই। তখন এরা স্কুলের গণ্ডি ছাড়ছেন। ১৯৭০ এরপর *পাগলা ঘোড়া*। দুজনের সঙ্গে এর মধ্যে এসে জুড়েছেন সমর রায়চৌধুরী। *পাগলাঘোড়ার* স্বতন্ত নির্মাণ সাড়া জাগায়। বাংলার লিটল ম্যাগাজিন আন্দোলনে এক নতুন বাতাস, নতুন ভাবে ভাবার সূচনা, তিস্তার পার থেকে ওঠা ঐ বাতাসের প্রধান কারিগর শ্যামল সিংহ চলে গেলেন। গত দু দশকে *পাগলা ঘোড়া*, *ক্রুসেড*–এর শরিক ছিল *দ্যোতনা*–ও। এর নির্মাণ–ও শ্যামল সিংহ ছিলেন আগাগোড়া। শ্যামলের ছোট ছোট ইচ্ছের মতো সীমিত কবিতার নির্মাণ ছিলো। তার যাবতীয় উচ্চাশা ছিলো কবিতার শরীরে। বাস্তবতার সীমা অতিক্রান্ত ঐ সব কবিতা তাই অনেক এগিয়ে, অন্তত সমকালীন পাঠকরুচির থেকে।

শ্যামলের প্রিয় কবি, বন্ধু ছিলেন শামশের আনায়োর, তাঁর মৃত্যুর পর *দ্যোতনায়* (নভেম্ববর–১৯৯৩) শ্যামল লেখেন কবিতা নিয়ে শামশেরের বিশ্বাস প্রসঙ্গে–T-S Eliot- A study in character and style থেকে জীবনদায়িনী কিছু উক্তি ও উদ্ধৃতি দিয়ে বোঝাতেন যথা– 'ইনসমনিয়া, নাইটমেয়ার, নার্ভাস ব্রেকডাউন অর্থাৎ ফিয়ার অফ সাইকোসিস ছাড়া আমার পক্ষে সম্ভব হতো না কবিতা লেখা, আর এটাই প্রকাশ করে একজন প্রকৃত কবির কবিতা লেখার অথেনটিক প্রসেস। 'শ্যামল কি নিজেও এই প্রসেস–এ বিশ্বাস করতেন না?''। তাই তো শ্যামল মানেই কবিতার চালু ভাবনার টুটি চেপে ধরা।

কবিতা গুচ্ছের কুয়াশা থেকে বরাবর আমি দূরে আছি
আমি বুঝি, একক কবিতার পায়ে বজ্র বিদ্যুৎসহ বৃষ্টিপাত।

ইতোপূর্বে উল্লেখ করেছি, ২০০৩–এর বইমেলায় শ্যামলদা ও আমার একসঙ্গে যাওয়ার কথা ছিল। শেষ পর্যন্ত একসঙ্গে যাওয়া হয় নি। সেই বইমেলায় শ্যামলদার শেষ বই *জেগে উঠছেন বাঘাযতীন* প্রকাশ হওয়ার কথা ছিল। আমরা পাই নি, প্রচ্ছদহীন একটা বই, সাদা কাগজে বাঁধাই করা এনেছিলাম। শ্যামলদা দেখেছিলেন, সদ্যজাতককে অপারেশন থিয়েটার থেকে বের করে এনে দেখালে নিরাপদ দূরত্ব থেকে বিস্ময়ে বাবা শিশুমুখ দেখেন তেমনি ছটফট করছিলেন। আক্ষেপ করছিলো কবে প্রচ্ছদ মুড়ে হাতে তুলে দেওয়ার মতো করে বইটি বেরুবে। কিন্তু এর মাঝেই ১৪ ই ফেব্রুয়ারি হঠাৎ দুপুরে বিজয়দা ফোন করলেন শ্যামলকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। কিন্তু আমরা সেখানে পৌঁছাবার আগেই শ্যামলদা আমাদের ছেড়ে চলে গেছেন। সেদিন ছিল 'ভ্যালেনটাইন্স ডে' প্রেমের দিন। সেদিনই কলকাতা থেকে প্রচ্ছদ মুড়ে *জেগে উঠছেন বাঘাযতীন* উত্তরবঙ্গে আসে।

সমর রায়চৌধুরী শ্যামল প্রসঙ্গে লিখেছেন—সামান্য কিছুতে কতো বেশি খুশি হওয়া যায়, তা কেবল শ্যামলই দেখিয়ে গেছে আমাদের, প্যারিস–সুইজারল্যান্ডে ঘুরে আসা

মানুষের খুশির উচ্ছ্বাসের চাইতেও বাড়ির অদূরে হলদিবাড়ির রাস্তায় ঘুরে আসা মানুষের খুশির ছিল। সামান্য লাউঘণ্ট ধনেপাতা বা পেঁয়াজকলি পেলে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠতম বিরিয়ানি খাওয়ার আনন্দ তাঁর কাছে ছিল একইরকম। দেবব্রত বিশ্বাস, শেক্সপীয়র, জীবনানন্দ, লোরকা, ঋত্বিক আর মার্কেজই ছিল তার পৃথিবী।'

শ্যামল সিংহের মৃত্যুর পর তার স্মরণ সভায় বিজয় দে একটা স্মরণিকা প্রকাশ করেন। সেখানে বিজয় লিখেছেন—ততদিন শ্যামল নিঃশব্দে একের পর এক কবিতা লিখে গেছে। আমরাও কোনো কথা বলি নি। আজ বলবো, চেঁচিয়ে বলবো। জীবিত শ্যামলের চেয়ে মৃত শ্যামল দীর্ঘজীবী হোক। রাশি রাশি মৃত জীবিত কবিতা এসে আমাদের হাত ধরুক।

এখানে ছবি আছে

বড় বড় জায়গার কেন্দ্রস্থলে আমরা বাস, পুজো করবো
বিশ্বনন্দিত গণিকালয় এবং
টক ঝাল ও গন্ধময় মদে মত্ত এই দেশ,
বিপুল শোষণ শিল্পে ও সেনায়।

একটি ফুল ছিঁড়েছি তাতে ভেঙে গেল পৃথিবী আমার...

আমি অপেক্ষা করি এমন এক মুহূর্তের যখন মৃত্যু রূপান্তরিত হয়
জীবনে, জল শূন্যে গিয়ে হারিয়ে ফেলে রূপ, ফুল যখন সূর্যের
সাথে সম্পর্কিত হয় স্বেচ্ছার অতিথি হয়ে চলে আমি তোমাদের
ঘরে অপরিচিত এক পুরুষের সাথে এখানেই আমার পরিচয়।
আমরা পতঙ্গোরা ফুলের স্বপ্ন হয়ে মৃত্যুকে অতিক্রম করি।

–প্রপাতের দেবতা ও কুকুরগুলি, শৈলেশ্বর ঘোষ

অবশেষে শৈলেশ্বরও মৃত্যুকে অতিক্রম করে চলে গেলেন। *জন্মনিয়ন্ত্রণ* (১৯৬৩–৬৭), *অপরাধীদের প্রতি* (১৯৭১) অনেক বছর পরে *দরজা খোলা নদী* (১৯৮০) এবং তারও

কয়েক বছর পর *পূর্ণগ্রাস* (১৯৮৪), *উৎসব* (১৯৮৮) এবং *আমাদের এই বীজক্ষেত্র* (১৯৯৩) ৫টি কবিতার বই, এ যেন তাঁর কেবলই নিজের ওপর ভর করে নিজের চারপাশে আমূল খুঁড়ে চলা।

৬০–র দশকে বাংলা সাহিত্যের স্থিতাবস্থাকে প্রবল ঝাকুনিতে টলিয়ে দিয়েছিল *হাংরি জেনারেশন*। শৈলেশ্বর ঘোষ ছিলেন হাংরিদের মধ্যে সবচেয়ে শক্তিশালী শক্তিশেল। শেষ দিকের লেখাতেও তিনি ছিলেন সমান বারুদ বিস্ফোরণকারী, ক্ষমতার অমোঘ পঙক্তিতে বিস্ফোরণ ঘটিয়েছে : 'এক হাতে রিভলভার ও তিনটি আওয়াজ মৃতদেহ দুটি পাশাপাশি পড়ে, একটি সেই যুবকের যে সকলকে পরীক্ষা করতে এসেছিল আশাতীত নির্জনতায় হত্যাকাণ্ড হবার পর থেকে একটুকরো কাগজ পড়ে গেছে, এস রমণশীল মানুষ, সূত্রধরে খুঁজে যাও তোমার বংশানুক্রমিক অপরাধীদের।'

শারদোৎসবের প্রস্নতুতিতে বুঁদ বাংলার প্রাক–উৎসবের হট্টমেলায় নীরবে চলে গেলেন শৈলেশ্বর ঘোষ তাঁর কবিতার বই *উৎসব*সহ ৬টি কবিতার, যা পাঠককে আবহমানকাল ধরে নিয়ে যাবে এক ভিন্নতর কবিতা–পৃথিবীর নাভিকেন্দ্রে। ১৮ অক্টোবর ২০১২, তাঁর অন্তিম উড়ান এক স্তব্ধতা নিয়ে এলো। 'একটি ফুল আমি ছিঁড়েছি, তাতে ভেঙে গেল পৃথিবী আমার।'...

মহালয়ার রাতে বুকে অসম্ভব ব্যথা শুরু হয় তাঁর। মাসখানেক আগেই হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হয়েছিলেন। চিকিৎসক পেসমেকারের কথা বলেছিলেন। সেই প্রস্নতুতিও নিচ্ছিলেন। মহালয়ার পরদিন তাঁকে আর.জি কর–এ ভর্তি করা হয়, কিন্নতু অবস্থার উন্নতি হয় নি। ১৮ অক্টোবর দুপুর পৌনে তিনটে নাগাদ অপারেশন থিয়েটারে নিয়ে যাওয়া হয়, কিন্নতু আর জ্ঞান আসে নি, রাত এগারোটা দশ, আমাদের ছেড়ে চির নিদ্রায় চলে গেলেন শৈলেশ্বর ঘোষ। ৭৩ বছর বয়স, ক্রমাগত ক্ষতবিক্ষত হওয়া এই মানুষটার সৃজনের পরিমাণটা যদি ঐ অঙ্কের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ হতো তা হলে পাঠককে আগামী বহুবছর সন্তিত হয়ে তার স্বাদ নিতে হত। কিন্নতু পাঠকের দুর্ভাগ্য যে তিনি লিখেছেন খুব কম, পাঠকের হাতে পৌঁছেছে আরও কম। আপাদমস্তক ক্ষমতাবিরোধী শৈলেশ্বর বাংলা কবিতার সবচেয়ে আক্রমণাত্মক ও 'দুর্বিনীত কবি'। তিনি শব্দকে আয়ুধ করেছেন ভাষার অচলায়তনের প্রাচীর ভাঙার অন্তর্ঘাতের তাড়নায়। তাঁর মৃত্যুর পর বন্ধু ও সাথী সব্যসাচী সেন লিখেছেন–'ক্ষমতার মূল্যবোধে দীক্ষিত ও শিক্ষিত মানুষের মৃতভাষায় তিনি আর কথা বলতে পারেন না এই সকল মৃত আত্মা তাই এই ভাষা বুঝতে পারে না।' শৈলেশ্বর ঘোষণা করেছেন–'অন্তর্ঘাত চালিয়ে যাব'। শেষদিন পর্যন্ত তিনি তাঁর প্রত্যয়ভূমি থেকে নিজেকে উৎখাত করেন নি। তিনি আমৃত্যু আত্মমগ্ন হয়ে নিষেধাজ্ঞা অমান্য করার আনন্দ নিয়ে লিখেছেন উপদ্রুত ভাষায়, প্রচলিত ছকের বাইরে রূপ ও রীতিনাশক অন্তর্ঘাতী কবিতা।

কোন শীতের রাতে চাঁদর মুড়ি/ দিয়ে আমার যাওয়া/সময় হবে
পরে থাকবে কিছু/আধপোড়া সিগারেট/ছাই, ছেঁড়া জামা, অভুক্ত খাবার
ধূসর পাণ্ডুলিপি/ইস্ত্রিবিহীন পাজামা পরে নেবো/ মনে পড়বে সেই কথা/
এ কোন বিষয় নয় কেবল/ অসমাপ্তের আত্মগোপন।
–ক্রুর অভিনয়/অপরাধীদের প্রতি

সেবার জলপাইগুড়ি বইমেলায় আমাদের কাগজ বের করার প্রস্নতুতি চলছে। দুই শহর, শিলিগুড়ি জলপাইগুড়িতে চলতো আমাদের নৈশ উল্লাস, কবিতাযাপন। শিলিগুড়ি হকার্স কর্নারে চিড়া ও কাঁচালঙ্কার সাথে 'সেভেন্টি'র সাথে আড্ডা, কিশোর কি রাজা সরকার তার ঝোলা থেকে বের করলেন শৈলেশ্বর ঘোষের *প্রতিবাদের সাহিত্য*। আমরা এক ভিন্নতর চেতনরাজ্যের কাব্যরূপের ম্যানিফেস্টোর সঙ্গে পরিচিত হলাম যেখানে ইতিহাসের আলোচনায় গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে 'ইতিহাসের বাইরের লোক'। জীবনানন্দ থেকে শুরু করে র‍্যাঁবো, সিলিন কিংবা অতোঁ, জাঁ জেনে, যারা সম্পূর্ণ বিপরীত স্রোতে সাঁতারে এসে ভেজা হাতে মানুষের খড়ের মূর্তির মুখোশ ছিঁড়ে ভেতরের খড়কুটো উন্মুক্ত করে দেয়। সমাজের আলোর বৃত্তের বাইরের অলস ভাঁড়, লম্পট ও বেশ্যারা কেন্দ্রবিন্দুতে চলে আসেন। সেই সংখ্যা *দ্যোতনার* প্রচ্ছদে ব্যবহৃত হয়েছিল শৈলেশ্বরের 'আত্মখাদক' এর অংশবিশেষ–

শরীরের গন্ধ ক্রমশ দীর্ঘ হয়ে চলে আর সেইসব ছেলেরা ঘুম থেকে জেগে উঠে
হঠাৎ স্বপ্নবশত ভালোবেসে ফেলে মাটির এই পৃথিবীকে, ক্ষুধা ও কামনার
আমাদের রোমাঞ্চনা লোমকূপে ভেসে থাকে, কেবল স্তব্ধতা ও অবহিত হবার জন্য
আমরা বেরিয়ে পড়ব হাতে টাকা কাঁধে বন্দুক হৃদয়ে হল্লা ও বুকে ঘৃণা নিয়ে
মাতৃশরীর ক্রমাগত শিশুকেই প্রশ্ন করে, 'বল তবে তুই আমাকেই ভালোবাসিস
–ক্ষুধার্ত–৩ তৃতীয় সঙ্কলন

এর সঙ্গে বিকাশ লিনোকাটে একটা স্কেচ করেছিল। এক নারীর শরীর, তার যোনি থেকে মাছের কঙ্কাল উঠে গেছে সটান উপরের দিকে, বৃক্ষের মত। আমাদের কবিতা–যাপনের হিরো তখন জীবনানন্দ থেকে বিনয় মজুমদার, অরুণেশ, শৈলেশ্বর, ফাল্গুনীর কবিতা আমাদের দৈনন্দিনের খাদ্য হয়ে উঠলো। জন্মেছিলেন ১৯৩৮–এ, বছরের শেষ দিনটিতে। বাংলাদেশের বগুড়ার রাজাপুর গ্রামে। দেশভাগের পর, ১৯৪৮–এ চলে আসেন উত্তরবাংলার বালুরঘাটে। বালুরঘাট কলেজ থেকে আইএসসি পরীক্ষার পর চলে আসেন বহরমপুর। কেএন কলেজ থেকে বিএসসি। জড়িয়ে পড়েন রাজনীতিতে। একবছর পরে বালুরঘাট ফিরে যেতে বাধ্য হন। ১৯৫৮–তে স্নাতক হন বালুরঘাট কলেজ থেকে। এরপর কলকাতায় মানিকতলায় টিউশনিকে অবলম্বন করে সিটি কলেজে অনার্স নিয়ে পড়তে থাকেন। কিন্নতু আর্থিক কারণে পড়া অসম্পূর্ণ রেখে বালুরঘাট ফিরে যান। জেলা গ্রন্থাগারে সহকারীর কাজ নেন। আবারও সব ছেড়ে চলে আসেন কলকাতায়। ১৯৬২–তে হিন্দ মোটরে 'কেতরং ভূপেন্দ্র স্মৃতি বিদ্যালয়ে' শিক্ষকতার চাকরি নেন। থাকতেন বন্ধু সুভাষ ঘোষের সঙ্গে। এ সময় হাংরি আন্দোলনের সূচনা হয় এই বঙ্গে। ১৯৬৩–তে *এষণা* পত্রিকায় শৈলেশ্বরের প্রথম কবিতাটি 'ঘোড়ার সঙ্গে ভৌতিক কথাবার্তা' বের হয়। একটা ধাক্কা লাগলো কবিতার সনাতন পাঠকদের। সে বছরই হাংরিদের একটা লিফলেট বের হয়, সেখানে তাঁর 'তিন বিধবা' কবিতাটি ছাপা হয়। হাংরিদের লেখালেখি নিয়ে তখন বাংলার সাহিত্যজগৎ মূলত কলকাতাকেন্দ্রিক সাহিত্যে তীব্র আলোড়ন ওঠে। মলয় রায়চৌধুরী, বাসুদেব দাশগুপ্ত, সুভাষ ঘোষ, ফাল্গুনী রায়, সুবো আচার্য এবং শৈলেশ্বর তাঁদের বিস্ফোরক লেখালেখির মধ্য দিয়ে রীতিমতো 'সদর দরজায় কামান দাগে'। শৈলেশ্বরের কথায় 'আধুনিকতার শবদেহের উপর উল্লাসময় নৃত্য'। ক্রমশ স্থিত ও স্থবির হয়ে আসা সাহিত্যের দুর্গে এই আঘাতের বিরূপ প্রতিক্রিয়া হয় মারাত্মক। সাহিত্যের বাজারে তখন চলছে বিগ হাউজের প্রবল দখলদারি। এই ক্ষমতার শক্তি হৈ হৈ করে উঠলো। সঙ্গে সঙ্গে গেল গেল রব উঠলো শাসকের বুকেও। ক্ষমতার রক্ষক প্রতিষ্ঠান, শৈলেশ্বরদের আক্রমণের সূচিমুখ ছিলো প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধেই। এই ক্ষমতার প্রতাপ নিয়ে শৈলেশ্বর এক সাক্ষাৎকারে বলেছিলেন– 'মানুষের দুঃখ সৃষ্টি করে ক্ষমতা। ক্ষমতা মানুষের অস্তিত্বকে মিথ্যা করে দেয়। তাকে পরাধীন করে। প্রবল অবদমনের সাহায্যে স্বাভাবিকতাকে বিকৃত করে। মানুষকে তার অস্তিত্বের স্বাভাবিক অবস্থা বুঝতে দেয় না। মানুষের সংবেদনার দরজাগুলি রুদ্ধ করে তাকে চেতনার অতি সংকীর্ণ অঞ্চলে আটকে রাখে। কবিতা স্বাধীনতার কথা বলে। সংবেদনাকে মুক্ত করে চেতনা সম্প্রসারিত করে। ক্ষমতাকে আক্রমণ না করলে, ক্ষমতা তার মূল্যবোধ দিয়ে যে ভাষাকে 'নির্মাণ' করে দেয়, যে ভাষা দিয়ে অধিকাংশ কবি লেখকই লেখেন, তাকে নিজের ভিতর থেকে ধবংশ না করে একেবারে নিজের ভাষাটি পাওয়া সম্ভব নয়। (কবিতা প্রতিমাসে) স্বাভাবিকভাবেই ওদের কলম থামাতে রাষ্ট্র সক্রিয় হয়ে উঠলো। ১৯৬৪–র ২ সেপ্টেম্বর টালার ঘর থেকে গ্রেপ্তার করা হলো শৈলেশ্বর ও সুভাষ ঘোষকে। পুলিশের ডাইরিতে অপরাধ হিসেবে লেখা ছিল 'অশ্লীল রচনা ও রাষ্ট্রবিরোধী কার্যকলাপ'। মুক্তচেতনা নিয়ে লেখালেখির কারণে কবির প্রতি রাষ্ট্রের রুষ্ট হওয়ার ঘটনা আবহমান কাল থেকে হয়ে আসছে, কিন্নতু ৬০–র দশকের এই ঘটনা একটা তীব্র আলোড়ন তোলে। এই ঢেউ পৌঁছে যায় আমেরিকাতেও। *টাইম* ম্যাগাজিনে গুরুত্বের সঙ্গে খবরটি প্রকাশিত হওয়ায় বিশ্বের লেখক ও সংবেদনশীল সমাজের কাছে খবরটি পৌঁছে যায়। এই গ্রেপ্তারের ঘটনার ধাক্কা ব্যক্তিজীবনে শৈলেশ্বরকে কীভাবে সামলাতে হয়েছে সে প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন–' আমি যে বাবা–মাকে ছেড়ে সেই ১৬/১৭বছর বয়স থেকেই বাইরে ঘুরতে শুরু করেছিলাম এটা তাঁদের কষ্টের কারণ হয়েছিল। আমার জীবন এবং লেখালেখি সম্পর্কে যা প্রচার হয়েছিল সেটা তাঁদের কানে গিয়েছিল। ওরা বুঝে গিয়েছিলেন যে আমি একেবারেই গোল্লায় গেছি। মুখে কিছু বলেন নি, খুব ভয় পেয়েছিলেন। গ্রেপ্তারের পর কর্মস্থলের প্রতিক্রিয়া ছিল বড়ো রকমের। ছাত্ররা ছোটো। তাদের পক্ষে সমস্ত জিনিসটা(মানে সেদিনের প্রতিষ্ঠিত মধ্যবিত্ত সমাজের চোখে এটা কতটা জঘন্য) বুঝতে পারে নি, পারার কথাও নয়। তারা খুশি ছিল এই কারণে যে তাদের মাস্টারমশাই যখন চুরি, ডাকাতি বা অন্যকোনো দুষ্টু কাজ না করেই পুলিশের হাতে ধরা পড়েছে, নিশ্চয়ই এর মধ্যে বীরত্বের কিছু একটা থাকবে। সেটা ৬–এর দশক। বিরুদ্ধ রাজনীতির প্রভাবে ভায়োলেশনের প্রতি এমনকি অতি তরুণদের অনেকের মধ্যেই একটা আকর্ষণ তৈরি হয়েছিল। কিন্নতু আমার কর্মস্থলের কেউ কেউ চাইলেন বরখাস্ত করতে, কেউ চাইলেন সাসপেন্ড করতে, কিন্নতু শিক্ষকদের মধ্যে দু–তিনজন আমার বন্ধু ছিলেন। তাদের চেষ্টায় কাজটা থেকে গেল।' শৈলেশ্বরের এই কারাবাস অভিজ্ঞতা প্রতিফলন কি 'আত্মখাদক' গদ্যে পড়েছিল–'আমরাও যদি অপরাধে তবে এই জেলখানায় বসেও স্বপ্ন দেখে যাব, যদি পাপবিদ্ধ বুকে ইন্দ্রিয় না জাগে, যদি সংবেদনশীল যৌনাঙ্গের প্রতি নপুংসকতার শাপ বর্ষিত অতি প্রাকৃত শরীর কৃতজ্ঞতার কোন চিহ্ন পৃথিবীতে রেখে যাব না।'(ক্ষুধার্ত)

যে ক্ষমতা নপুংসকের সাফল্যনামা তৈরি করে তার বিপরীত স্রোতে গা ভাসিয়েছিলেন শৈলেশ্বররা। হাংরিদের সম্পর্কে গ্রেপ্তার হওয়ার ঘটনার অর্ধশতক পর এক সাক্ষাৎকারে তিনি বলেছিলেন–'হাংরি লেখালেখির প্রাসঙ্গিকতা কমে নি। Life term without

powole দিয়েও তার স্পিরিটকে মারা যায় নি। ঐ স্পিরিটটাই আসল জিনিস। নিজের ভিতর থেকে ক্ষমতাকে বিলুপ্ত করে নিজেকে এবং প্রতিটি পাঠককে, মুক্ত করার, স্বাধীন করার এই প্রচেষ্টা বাংলা সাহিত্যে আগে কেউ করে নি। যে লেখা মানব–অস্তিত্বের সংকটের সময়ের বন্ধু হয়ে যেতে পারে, তার স্পিরিটের মৃত্যু সহজে হয় না।'

আশির শুরু, সদ্য স্কুলের গন্ডি ছেড়েছি। মাথার মধ্যে পোকা ও মথের লোমশ উড়ান। ঝমঝমে বৃষ্টির এক কাদামাখা বিকেলে হাতে এল *নরকে এক ঋতু* লোকনাথ ভট্টাচার্য অনূদিত র‍্যাঁবোর এই বইটি পড়তে দিয়েছিলেন *শব ও সন্ন্যাসী*র স্রষ্টা অরুণেশ ঘোষ, কী পণ করেছিল তরুণী সে–ওয়াজের তীরে/ বাণী নেই পাদপের, পুষ্পরিক্ত তৃণদল, আকাশ ঢেকেছে;/ আমার নিবিড় প্রিয় নীড় হতে দূরে/ পান্না করা হলদে মাটির ভারে?/ সে কোন সোনালী সুরা, যাতে ঘাম ঝরে!'(শব্দের রসায়ন/ র‍্যাঁবো) অথবা 'প্রতিটির মধ্যরাত তোমাকে পেরুতে হয়/ নরক ও নক্ষত্রলোকের নদী, কোথায় স্পষ্টতা?/ হেসে, বাঁহাতে সরিয়ে দাও সব হাঁ–হাস্যকর/ শুধু একটি আঙুলের স্পর্শ কর মাটি?' (শব ও সন্ন্যাসী/ অরুণেশ ঘোষ) এভাবে শব্দের রাসায়নে মটকা লাগা এক সন্ধ্যাতেই বিকাশ নিয়ে এল *জন্ম নিয়ন্ত্রণ*, হাংরি শৈলেশ্বরের কবিতার বই। পাতলা পৃষ্ঠায় বারুদঠাসা বই, গয়ারকাটায় বিকাশদের বাড়ির পেছনের সেতুর উপর খরদুপুরে দুজনে পড়েছিলাম —

যোনির দ্বিতীয় নাম জেনেছি জীবন
কবিতার প্রথম নাম ধর্ম, দ্বিতীয় নাম আত্মা
...
তামা ও ইস্পাতের ব্যবহার থেকে আমাকে ফিরিয়ে নিয়ে চল
নবান্নের অভিপ্রায়বশে যারা গিয়েছিল মাঠে জেনেছে
তারা সব? এমনকি আজ অধঃস্তন পুং মানুষও ফিরে এল না ঘরে
আমার ঘর আজ ফাঁকা এঘরে দুজন স্ত্রীলোক নিয়ে আমি শুয়েছিলাম
এ ঘরে আমার পুরুষ প্রেমিকার গায়ে শুয়েছিলাম আমি
...
আমার অন্য উপায় নেই স্ত্রী লোক রয়েছে শুয়ে
তার জরায়ু দেখেই মরতে হলো আমাকে
তবু মানুষের কাছে ফিরে আসে আগামী কাল মানুষের ভবিষ্যৎ নাই
...
মায়ের গর্ভের কথা আজ মনে হয় দশ দিকের
গর্জন ছুটে আসছে দশটি পাপের দশটি পুণ্যের
বিনিময় সহজ অন্তঃকরণ নিয়ে চলে যাব আমি প্রস্তুত।

তৃষ্ণা বেড়ে গেল আমাদের। আরও বই চাই, কিন্তু শৈলেশ্বরের বই কই! বাজারে নাই। অরুণেশদাই দিলেন *দরজা খোলা নদী*। তার বছরখানেক আগে বেরিয়েছিল— 'মৃত্যু ও অভয় দুই অংশের মধ্যে একটুখানি ফাঁক, নিষেধ থাকে না বলে জীবন থাকে না বলে জীবাণু থাকে বলে সাধু ও চোর সতী ও সমকামী মুখোমুখি দাঁড়িয়ে হাসছে।'(নির্গমন পথ)

শৈলেশ্বর হাংরিদের মধ্যেও ছিলেন স্বতন্ত্র, তীব্রতম। জীবনানন্দকে স্বীকার করে তিনি এগিয়ে যান, নিজের মত, তার সঙ্গে ছিল পূর্বের অভিজ্ঞতা ও পাশ্চাত্যের কবিতা পাঠ–অভিজ্ঞতা। 'চল্লিশের সমাজচেতনাকে তিনি সমাজের প্রতি ঘৃণা ও আক্রোশের ভিত্তিভূমি করে তোলেন, পশ্চাতের উৎকেন্দ্রিক আত্মমুখীনতাকে যৌনতার স্বাধীন শক্তিতে প্রতিষ্ঠিত করেছেন।'(উদয়শংকর বর্মা) এতে প্লেটোনিক রোমান্টিকতা নেই, সুড়সুড়ি নেই, আত্মকেন্দ্রিকতা মুক্ত সামাজিক যৌনতা। যৌনতাও এখানে বিপন্নতার বার্তা নিয়ে হাজির।

অভিনয় শেষ, ঘষে ঘষে তারা রঙ তোলে মুখের
নিজস্ব পোষাক পরার পর, পুরুষ স্ত্রী কেউ কাউকে চিনতে পারে না
মঞ্চে পা–ফাঁক করে দাঁড়াবার সময় পুরুষটির ভালোবাসা ছিল
এখন ঘর ফাঁকা, মুখগুলি নিতান্ত স্বাভাবিক, আছে শুধু ঘৃণা।
–অভিনয়ের পরে

এই কবিতায় আমরা দেখি একজন মহিলা গণিকার ভূমিকায় অভিনয় করছেন মঞ্চে আর দর্শকরা সহ–অভিনেতা হয়ে একে একে তার সঙ্গে যৌনরত হচ্ছে। প্রেমমুক্ত সম্পর্কের এই আখ্যানের শুরু হয়েছিল জীবনানন্দে, তার থেকে আরও নির্মম ভাষ্যে তা আনলেন শৈলেশ্বর। 'রতিবন্দি মানুষ আমরা কখনও যুদ্ধবন্দিও বিনিময় করি। আনন্দনগরীতে গণিকারাই পেয়েছে শুধু সময় নেভানো ঘড়ি/ আমাদের ক্ষুধা কিন্তু ভিন্নপথে চলে, ফুলে ওঠা স্তনগুলি হিংস্র নখে ছিঁড়ি/ তাকিয়ে দেখেছি উপরেও নাই আর কোন ধর্মের সিঁড়ি।' (স্বপ্ন দর্শন)

শৈলেশ্বরের কবিতাযাপনকে কয়েকটি ভাগে ভাগ করে নেওয়া যায়। হাংরি প্রথম পর্বের *জন্ম নিয়ন্ত্রণ, অপরাধীদের প্রতি*র উগ্র এক টার্মিনেটর যেনো সে। অরুণেশের ভাষায়–'ক্ষতবিক্ষত ও আত্মভুখ'। সেই শৈলেশ্বর তার যুদ্ধ শুরুর সাথীদের প্রতি কিছুটা অভিমানেই কয়েকবছর লেখালেখি থেকে দূরে থাকেন। এ সময় তার পারিবারিক

বিপর্যয়ও এর কারণ হতে পারে। বেশ কয়েকবছর পরে, ১৯৮০–তে *দরজা খোলা নদী* লেখার সময় তার সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে ছিলেন অরুণেশ ঘোষ। তার ভাষায় *দরজা খোলা নদী*র কবিতাগুচ্ছ লেখা হবার সময় আমি তার বাড়িতেই ছিলাম দিনকয়েক। একটা ঘোরের মধ্যে সে লিখে যাচ্ছিল একের পর এক অসাধারণ সব কবিতা। জেমস জয়েস 'এ্যাপিফ্যানি' বলেছেন, রবীন্দ্রনাথ বলেছেন 'নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ', শৈলেশ্বরের সেটা ঘটেছিল ওই কবিতাগুচ্ছ লেখার সময়ই। তার ভাষাপ্রবাহই তাকে টেনে নিয়ে চলেছে দূর থেকে দূরে। সীমাবদ্ধতা থেকে অনন্তের দিকে।'(অবাঞ্ছিত একক যুদ্ধ)

দরজাখোলা এক নদীর মধ্যে ঢুকে পড়েছি আমি
এই আমার আকাশপথতলতাগুল্মহীন, চিরকাল
জেগে আছে নক্ষত্রের রাত

শৈলেশ্বর এখানে কিছুটা পরাবাস্তবতার দিকে ঝুঁকে যান। নরম তুলতুলে অনুভূতির সুগারকোট বাক্য তার পছন্দ নয়। তাই তিনি ঘা মারাকেই আবশ্যিক করে তোলেন— 'মানুষের মাথার উপরে এক আকাশ নীল হয়ে আছে আলো/ তাপ, রস টেনে আমরা ভালবাসা করি,/ আবার কখনও যাই গণিকার ঘরে/ আমাদের জীবন একমুঠো শস্যকণার মত আছে আমাদেরই হাতে।'

১৯৭১–এ *ক্ষুধার্ত*–এ শৈলেশ্বর লিখেছিলেন—'আমি মনে করি ভাষা=বিষয়=স্রষ্টা নিজে=চৈতন্য=সেই সমাজের যা কিছু গোপনীয়, নিষিদ্ধ হয়ে মানুষের দুর্ভাগ্য রচনা করে তাকে প্রকাশ্যে সংগঠিত ও সংঘটিত করা।' (শিল্প ও সত্য) এর দুদশক পরে এক সাক্ষাৎকারে তিনি বলেন—'বিচার সীমার বাইরে থেকে সত্তা কথা বলতে শুরু করলে কবিতার জন্ম হয়। ভাষার কাঠামোর মধ্যেই সত্তাটি লুকিয়ে থাকে। ব্যক্তির সঙ্কটমুহূর্তে সেই সত্তা কথা বলতে শুরু করে।...সাময়িক উত্তেজনা থেকে যে সব রচনা লেখা হয়, তাতে ভাষার এই লুকোনো সত্তাটি আত্মপ্রকাশ করে না।'(কারুবাসনা, ২০০৮) উল্লেখ করা যেতে পারে২০০৭–এ বের হয় তাঁর প্রবন্ধগ্রন্থ *ভাষা বিমোচন*। সেখানে ব্লার্বটিতে লেখা আছে 'ক্ষমতার ভাষা যে সব মূল্যবোধের মোড়কে মানুষকে ঢেকে রাখে, সেগুলি থেকে ভাষাকে মুক্ত করতে পারলেই সম্ভব ভাষার মুক্তি বা বিমোচন।' এই গ্রন্থে এ গুরুত্বপূর্ণ কথা লিখেছেন শৈলেশ্বর 'ক্ষমতার ভাষা আমাদের অস্তিত্বের মৌলিক অবস্থানকে অস্বীকার করে এটা আমাদের সবচেয়ে বড়ো ট্রাজেডি' (পৃষ্ঠা ৯) তিনি আরও দেখিয়েছেন যে আমাদের নিজেদের ভাষা না থাকায় আমাদের অস্তিত্বের মধ্যে ঘটে চলা বিবর্তনকে, সেই অভিজ্ঞতাকে আমরা প্রকাশ করতে পারি না। চেতন জগতে বিরাট অন্তর্ঘাত না ঘটলে মানুষের ক্ষমতার ভাষাকেই বৈধ ভাষা বলে ভাবতে থাকে।

'অন্ধকারের নির্জনতা থেকে এক করুণ গান ভেসে আসে, হতে পারে কোন মন্দির বা হাসপাতাল থেকে বা পৃথিবীর সবচেয়ে একা কোন মানুষের এই স্বরধ্বনি আমাকে ক্ষিপ্ত করে, আমি লুকানো অস্ত্র হাতে তুলে নিই...' *ভাষা বিমোচন শৈলেশ্বরের অন্তিম গ্রন্থ। এর আগে আমার হাতে আসে উৎসব*, তার বাড়িতে গেলে কালো প্রচ্ছদে মোড়া বইটি তিনি দিয়েছিলেন। দীর্ঘায়ত পঙক্তি যোজনায় এখানে শৈলেশ্বর এক অন্যরূপে আবির্ভূত। জীবনানন্দ থেকে বিনয় হয়ে আমরা শৈলেশ্বরে উত্তরণ ঘটতে দেখি কবিতাকে—

মুখ ঢেকে রাখো অবসান সূর্য–ধর্ম ছেড়েছি আমি ছেড়েছি বাস্তু জমিতে খোলস
কামনা আমাদের ছলনা আমাদের, ধাতুবাসনাও আমাদের, আমাদেরই
সঙ্গে এই ক্ষুদ্রতা খুন করে সেই শব বুকে বহন করা সেও আমাদের
প্রথা ভ্রমণের শেষে থাকে কিছু নিঃসঙ্গতা, আর থাকে কিছু গান

তপোধীর ভট্টাচার্য উত্তর–আধুনিক কবিতা প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে মন্তব্য করেছিলেন–'উত্তর–আধুনিক জীবন–চেতনায় ব্যক্তির সৃষ্টি সার্থক হতে পারে শুধু সমষ্টির সহযোগে।' শৈলেশ্বরের এই বইটিতে তারই প্রতিধ্বনি পাই– 'যতই পথ হাঁটছি ততই দীর্ঘ হচ্ছে রাত্রি...মানুষের গান শোনার জন্য বধির অন্ধকারে দাঁড়িয়ে আছে...' বইটির মলাটের উল্টোদিকে তার একটি গদ্যাংশ আছে 'আমরা বাতিল করে দিয়েছি সেই সব সাহিত্য যা মানুষ উপভোগ করে...কবিতা আমাদের কাছে শব্দশিল্প নয়। জীবন বাজি রেখে অনুসন্ধানমূলক এক যাত্রা, কবিতা আমাদের কাছে সক্রিয় শক্তি জীবনের অনুদ্ঘাটিত মাত্রা।'

শৈলেশ্বর সত্যি সত্যি তাঁর জীবনকে বাজি রেখেই কবিতা লিখে গেছেন। ১৯৬৭–তে বিয়ে করেন বান্ধবী সুনীতাকে। বেলগাছিয়ার একটিমাত্র ঘর ভাড়া নিলেন। মাত্র ২৫০ টাকা বেতনের স্কুল মাস্টারি। খুব কষ্ট করে সংসার চলে। সংসারে একটু সেতুর মতো কাজ করতো গান। সুনীতা ভাল গাইতেন। শৈলেশ্বরের প্রিয় ছিলেন জন লেনন এবং বব ডিলান। স্ত্রীকে মাঝে মাঝে বলতেন 'আমি অন্যদের মতো শব্দ দিয়ে কবিতা লিখতে চাই না, আমি শব্দ দিয়ে বেটোফেনের মতো সিম্ফনি সৃষ্টি করতে চাই।' ১৯৭১–এর স্বাধীনতা দিবসে জন্ম নেয় তার একমাত্র কন্যা জীজা। আগের রাতে বরানগরে রাষ্ট্রশক্তি ও গুন্ডাশক্তি সংঘঠিত গণহত্যা ঘটে গেছে, স্বপ্নদেখা যুবকদের হত্যাপুরী পাঠিয়ে নৃশংসতার চিহ্ন হিসাবে মুখে আলকাতরা লাগিয়ে দেওয়া হয়; নদীতে ভাসিয়ে দেওয়া হয় অনেক মৃতদেহ। বরানগরে গণহত্যার সেই কালরাতেই জীজা জন্মের প্রসববেদনা

উঠছিল। সে রাতে শৈলেশ্বর লিখছিলেন 'নামহীন মন্ত্র পরম্পরা' কবিতাটি। সুনীতা দেবীর ভাষায় 'সকাল ৬টায় রিকশায় চাপিয়ে নিয়ে গেল আর.জি কর হাসপাতালে। কোনো বেড খালি নেই। শুইয়ে রাখলো মেঝেতে। সেইদিনই ১.৩০–এ জীজার জন্ম। সাতদিন ঐ মেঝেতে কাটালাম, তারপর চার পাউন্ডের বাচ্চাকে নিয়ে রিকশায় চেপে বাড়ি এলাম। আর্থিক দুরবস্থায় চরমে। হাতের চুড়ি, কানের দুল বিক্রি করে বেবিফুড কিনতে হয়। শৈলেশ্বরও সব সময় সুস্থ থাকে না। প্রায়ই অসুস্থ হয়ে পড়ে। আমার ভীষণ আতঙ্ক হতো। একদিন বলেছিল আমাকে–বাখের জীবন জানো তো? অতবড় শিল্পী মরে যাওয়ার পর কয়েকটি ছেলেমেয়ে নিয়ে স্ত্রীকে ফুটপাতে ভিক্ষা করে বাঁচতে হয়েছিল।'

পরিবারের উপর দিয়ে এভাবেই একের পর এক ঝঞ্ঝা বয়ে গেছে। কখনও সামলে নিয়েছেন, কখনও ভেঙে পড়েছেন। কিন্তু লেখালেখির জায়গায় কোনো ছাপ পড়ে নি। কোনো আপস করেন নি শৈলেশ্বর ঘোষ। দারিদ্র্য ও ক্রমাগত বিপর্যয় সামলাতে সামলাতে স্ত্রী আক্রান্ত হন জটিল মানসিক রোগে। ওষুধ ও মনোবিদের চিকিৎসাধীনে কিছুটা নিয়ন্ত্রণে থাকলেও কখনও কখনও ভয়ঙ্কর ভায়োলেণ্ট হয়ে উঠেছেন তিনি। জীবনের সবচেয়ে বেদনাদায়ক ঘটনার কথা বলতে গিয়ে তিনি বলেছেন–'বিয়ের মাত্র কয়েকবছর পরই, আমার কন্যাটির শৈশব থেকেই যার শুরু। মানসিক রোগে স্ত্রীর উন্মাদ হয়ে যাওয়া। ছোটো একটা ঘরে থাকি। ভায়োলেন্ট আক্রমণ। প্রায় বাইশ বছর কাটাতে হল এভাবে। এর মধ্যেই আবার ক্যান্সার আক্রান্ত হয়। ঠাকুরপুকুরে হয় চিকিৎসা। কপালের লিখন ছাড়া আর কী! কোন অভিযোগ নেই।' শুধু স্ত্রীর অসুস্থতাই নয়, তার আর বিড়ম্বনার কারণ হয়েছিল একমাত্র কন্যা। ১৯৯৮–তে বিয়ে দেন। কিন্তু ২ বছরের মধ্যে মেয়ের সংসার ভেঙে যায়। জামাই তখন অন্য নারীতে আসক্ত, মেয়ে জীজা বাবার কাছে চলে আসে। তখন সে সন্তান–সম্ভবা। মানসিক বিপর্যস্ত মেয়ে বাবার কাছে এসে অসুস্থ হয়ে পড়ল। চিকিৎসা চলাকালীনই জীজা একটি প্রিম্যাচিওর শিশুর জন্ম দেয়। ৫দিন বয়সী শিশুর পেটে বড় ধরনের অপারেশন করতে হয়। দীর্ঘ কয়েকবছর এই অসুস্থ মেয়ে ও মেয়ের কন্যাকে নিয়ে সুস্থতার খোঁজে অসীম শক্তি নিয়ে লড়ে যান শৈলেশ্বর একা। ২০০৫–এ জীজার আইন মেনে বিবাহ–বিচ্ছেদ হয়ে যায়। শিশুটিকেও বাবা অস্বীকার করে। এই ঝঞ্ঝার বুকে বসেই শৈলেশ্বর লেখেন–'এত আলো আসে'। শঙ্খ ঘোষ আবার আলোচনা প্রসঙ্গে লিখেছিলেন–'এই সব পণ্ডিতি ভাষণ সত্ত্বেও ইতিহাস অবশ্য থেকে যায়, আর এই ইতিহাসের অনেকটা অপচয় হয়ে গেছে সে কথা মনে রেখেও বিষণ্ন হবার কারণ ঘটে না যখন একজন শৈলেশ্বর ঘোষের মতো কবি অবিচলিত থেকে কেবলই ভেবে যান জীবনের বিন্যাস, নিজের জীবনযাপনকে সমস্ত অর্থেই মিলিয়ে নিতে চান তাঁর কবিতার সঙ্গে।' (শব্দ আর সত্য/ শঙ্খ ঘোষ) শৈলেশ্বর আঁতোয়া আর্তর একটি গদ্যের অনুবাদ করেছিলেন, *ক্ষুধার্ত–৩* তা বের হয়। তার শুরু ছিলত'তুমি বেঁচে থাকো এবং মরে যাও। এর সঙ্গে স্বাধীন ইচ্ছার কোন সম্পর্ক নেই। যেভাবে তুমি স্বপ্ন দেখ ঠিক সেইভাবেই তুমি নিজেকে হত্যা কর। মৃত্যুর জন্য কোন ক্ষুধা আমি বোধ করি না। আমার একমাত্র ক্ষুধা যেন আমি কখনই নপুংসকতার, অস্বীকৃতির, পরিত্যাগের ভোঁতা সম্পর্কগুলির আবর্জনা যা আঁতোয়া আর্তর সচেতন সত্তা গঠন করে বা তার চাইতেও দুর্বল, তাতে পরিণত না হই বা তার মধ্যে নিক্ষিপ্ত না হই।' শৈলেশ্বর চলে গেলেন, ৭৪ বছর বয়সে। মানুষ মরা মৃত্যুকে আশাতীত নির্জনতায় হত্যাকাণ্ড বলে চিহ্নিত করা যয়। যিনি লিখেছিলেন–'মৃতবৎসার বুকে রাখা ফুলগুলি আসলে আমাদের কল্পকাহিনী'। বাংলা কবিতার অন্যতম বিতর্কিত, যন্ত্রণাদগ্ধ মানুষটার জীবন ও মৃত্যুও এক 'কল্পকাহিনী'র সামনে আমাদের দাঁড় করায়!

অস্তির শিশিরবিন্দু মুঠো করে মিশে যাব ঘামে

অক্টোবর মাস, উৎসবের বাতাস উড়ছে যেন। আমাদের সান্ধ্য–আড্ডায়, জলপাইগুড়ি শহরের এক রেস্তরাঁয়, আমার সেদিন পৌঁছতে একটু দেরি হয়েছিল, ওঁরা চারজন অনেকক্ষণ আগেই হাজির হয়েছিলেন। টেবিলের চারপাশ দিয়ে যে উচ্ছ্বাস প্রতিদিন জমে থাকে এদিন যেন সেখানে এক জমাট বিষাদ। রণজিৎ দাশ–ই বললেন—অনন্যর খবর শুনেছ? না গো কী হলো, উনি তো অসুস্থ ছিলেন। 'ও আর নেই।' একটা লম্বা বিষাদের যতিচিহ্ন এরপর। দুপুরেই তুষার চৌধুরী ফোনে খবরটা দিয়েছিলেন ওঁদের। টেবিল ঘিরে তারপর দীর্ঘক্ষণ আমরা ৫জন, বিজয় দে, সমর রায়চৌধুরী, শ্যামল সিংহ আর রণজিৎ দাশ। স্মৃতির থেকে নানা টুকরো টুকরো ডানা উঠে আসছিল। কবিতার অনন্য লাইনগুলো। আসলে এভাবে খবরটার মোকাবেলা করতে হবে এটা ধারণার বাইরে ছিল আমাদের। আবারও এক আঘাতের মোকাবেলা করতে বাধ্য করলেন তিনি, অনন্য রায়।

এর কিছুদিন আগেই তাঁর *আলোর আলেয়া* নিয়ে আড্ডায় তুলকালাম হয়ে গেছে। *নীল ব্যালেরিনা* হাতে এসেছিল '৮৬ নাগাদ, চমকে পড়েছিলাম তাঁর কবিতাগুলো। বইটির প্রথম কবিতাটির শুরুটা আজও স্পষ্ট ধাক্কা দেয়—

আমি কলঙ্কিত করবো নম্র শাদা কাগজটার কুমারী স্তব্ধতা
অস্তির শিশিরবিন্দু মুঠো করে মিশে যাব ঘামে

সে সময় ঐ বইয়ের অনেক লঅইনই উচ্ছ্বসিত উচ্চারণে জমিয়ে তুলতাম আড্ডা। এ সময় ছিলো আমাদের নির্দিষ্ট কবিতাপাঠক হয়ে ওঠার সময়। এ সময় অনন্যর কবিতা আমাদের হাতে আসা সৌভাগ্যের। কবিতার যাবতীয় ফর্ম ভেঙে দেওয়ার নেশা যেন তাঁর। যেমন তাঁর 'রক্ত পরীক্ষা'—

রোগী : বিংশ শতাব্দী
চিকিৎসা : ড. কার্ল মার্কস এবং ড. অ্যালবার্ট আইনস্টাইন
তারিখ : ৬ আগস্ট ১৯৮৩
হিমোগ্লোবিন : ১৯০৩ সিগমুন্ড ফ্রয়েডের মনোবিকলন তত্ত্বের সাইকোটিন প্রতি শতাংশ
১২–৭ উড়ন্ত উপনিষদে চোবানো রোমশ ডিম একশো সেন্টিমিটারে প্রতি গ্রাম
১৯৭৫ অ্যাডলফ হিটলার ও মেরি ম্যাগদালেন সঙ্গমরত।
প্যারাসাইট। ১ ঈশ্বর।
অনুচক্রিকা। ৭ই নভেম্বর ১৯১৭
বি.দ্র. বিশেষ রক্ত পরীক্ষার জন্য এক পাইট পৃষ্ঠা প্রার্থনীয়
স্বাক্ষরকারী
অনন্য রায় (ইয়াঙ্কি শঙ্করাচার্য)

অনন্যর প্রচলিত কাব্যগ্রন্থের প্রথমটি *দৃষ্টি অনুভূতি ইত্যাকার প্রবাহ এবং আরো কিছু* বের হয়েছিল যখন তাঁর ১৭ বছর বয়স, ১৯৭২–এর নভেম্বরে। প্রথম কবিতাটির নাম 'কমরেড, একুশ শতাব্দী'।

প্রতিটি নিষ্ফল অপরাহ্ন আমাকে নতুন ভোরের দিকে টানে, অভিপ্রেত
চৌদিকে মেকং স্রোত অ্যাজোলার অঙ্গারবর্ণ হ্যানয়ের বাহু
আমাকে টেনে নিয়েছে তার সঠিক উম্বের মধ্যিখানে
যেখানে মা তার ছেলের জন্য খাবার রাঁধছে, শিশুর জন্য সেলাই করছে
নক্ষত্রের শার্ট
না কিছুই আমাকে বন্দী করতে পারে নি, পারবে না
না কিছুটা আমাকে হত্যা করতে পারে নি, পারফেক্ট
... ...
আমাকে দাও তোমার রুটি, বিদ্যুৎ তোমার নতুন পোশাকেও
শরীরের আরোপ কৌশল, পাথরের ডানা। দাও কুসুমের কঠোর
শিকড়–সিংহাসন। বলো, কোথা থেকে তুমি আসছ, কোথা যাবে, বলো
জীবনের অর্থ আছে কি না?

এক তীব্র রাজনৈতিক ঝঞ্ঝা তখন বাংলায়, একজন ১৭ বছরের যুবকের এই আবহেই জীবনের অর্থ বাজার অভিজ্ঞতার সূচনা, যার প্রত্যাশায় কুসুমের কঠোর শিকড়–সিংহাসন প্রাপ্তি ঘটেছিল কি না জানা নেই, তবে বাংলা কবিতা এক চিরস্থায়ী উচ্চারণে ঋদ্ধ হয়েছিল। ১৯৭২ থেকে ১৯৯০, মাত্র আঠারো বছরের এই কবিতাযাপন। যদিও উল্লিখিত *টিনএজর* কবিতার বইটি সম্পর্কে তার খুব একটা দুর্বলতা ছিল না। ১২ বছর পরে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে অনন্য বলেছিলেন—'ওটাকে আমি আমার নিজের লেখা বলে স্বীকার করতে চাই না।' এই কবিতা তার ভাষায় ছিল 'তরল দীর্ঘ কবিতা'; তবুও প্রাথমিক এই তরল কবিতাটিতেই যেন ভেঙেচুরে এগোনোর পর্ব সূচিত হয়েছিল তাঁর। যে অনন্য সম্পর্কে পরবর্তীতে সঞ্জয় মুখোপাধ্যায় লিখেছিলেন—'অত্যন্ত সজ্ঞানে ও সচেতনভাবে কোনরকম উৎকোচ ও ভীতিপ্রদর্শন ব্যতিরেকে আমি ঘোষণা করছি যে অনন্য রায় আমাদের সাহিত্যে একুশ শতকের প্রথম কবি।...অনন্য তাদের থেকে অনেক দূরে দাঁড়িয়ে আছে। স্বতন্ত্র, একাকী, দ্রাবিড়, ভার্টিক্যাল ইনডেভার।' এই অনন্যই লিখতে পারেন—

এইবার যাব প্রাক–ইতিহাস বন্য অন্ধকারে
যেখানে মানুষ, মানুষের মুখ, উচ্ছ্বাস বেঁচে থাকা
আমরা চেতনা বিশুদ্ধ আছে বলে আজও মনে হয়?
অন্য সকলে ব্রুট
আত্মা বাঁচাতে পরেছি মাথায় বেঢপকা গামবুট।
অথবা
ব্রিজের কুয়াশা চিরে ছুটে যায় তীব্র হাল্কা দ্বিরাচারী ট্রেন।
কাসান্ড্রা, তুমি সাতরঙা মদের পেয়ালা, মাংস, ঘন পারফিউম
যেন বা নক্ষত্র, গ্রহ, মাখনের গন্ধ হলদে চাঁদে
কেমন স্বাধীন;
আমি শ্যাওলার বলের মতো ঈশ্বরের মুখ
কী ট্রাজিক মিসাসট্রিপিক!

অনন্যর কবিতা আসলে কল্পনা ও ইমেজের ক্রম–উন্মোচনের আর্ট গ্যালারি। ১৯৭৪–এ তার *নৈশ বিজ্ঞপ্তি* বাংলা কবিতার ভিন্নমাত্রা সংযোজনের বিজ্ঞপ্তি। এই কবিতার বইয়ের পর পাকা দশ বছর তার নিশিযাপন, ফিল্মের সঙ্গীতচর্চার ভেতর দিয়ে নিজেকে 'শান' দিতে থাকেন। এক বল্গাহীন অশ্বের মতো। এ সময়ই সে ঋত্বিক ঘটকের ঘনিষ্ঠ, *যুক্ত তক্ক গপ্পোর* সহ–পরিচালক ও এক ব্যতিক্রমী রাজনৈতিক যুবকের ছবিতে অভিনয়। ফিল্ম নিয়ে অনন্যর একটা প্রেম ছিলই। পড়াশুনোও করেছেন প্রচুর এ নিয়ে। ব্যক্তিগতভাবে আমার যে দুবার অনন্য–সাক্ষাৎ ও আড্ডা হয়েছিল তার অনেকটাই ছিলো ফিল্ম নিয়ে ওঁর কথায় ভরা। জাঁ লুক গোদার ও তারাকোভস্কির সেলুলয়েড প্রবন্ধের সম্প্রসারণ ছিলো ওঁর কবিতার নির্মাণে।

অনন্য বলতেন—'আমি সাহিত্যকে মানুষের আন্তর্জাতিক স্বাধীনতা লাভের উপর ছাড়া কিচ্ছু ভাবি না।' এটা অন্তর্গত বিশ্বাস থেকেই তিনি বলতেন। তাঁর কবিতাকে এই পথেই চালিত করার চেষ্টা করেছেন। নিজেকে, তাঁর ও পারিপার্শ্বিক মানুষজনের অস্তিত্বকে দাঁড় করাতেন অমোঘতার সামনে। এই অভিযানে তিনি ক্রমশ একক কবিতা থেকে আরও আরও দীর্ঘতর কবিতার পথে এগিয়েছেন। ইবসেন প্রিয় অনন্যর ১৯৭১–০৯ আমিষ রূপকথা এই অভিযানে এক উল্লেখযোগ্য শিখর জয়, যাকে তিনি আত্মজৈবনিক প্রহসন বলে উল্লেখ করেছেন। এই *আমিষ রূপকথায়* অনন্য ছড়িয়ে দিয়েছেন তাঁর তৎকালীন যাবতীয় উপার্জনকে। সময়কে এভাবে, সমাজতত্ত্বকে এভাবে কবিতায় এনেছেন, নিজেরেই পুরনো কবিতা ছড়িয়ে ছিটিয়ে দিয়েছেন রূপকথার এই পর্ব নির্মাণে যে স্তম্ভিত হয়ে যেতে হয়। এই পাঠপ্রতিক্রিয়ায় ঘটে যায় নির্মম উন্মোচন। পাঠকের অন্তর্দহনও শুরু হয় এখান থেকেই। ১৯৮৩–তে প্রকাশিত *চুল্লির প্রহর*কে অনন্য বলতেন 'এটা জ্যান্ত প্রবন্ধতমানুষের অস্তিত্বের সংজ্ঞা, স্বাধীনতা, সীমানা এবং শূন্যতা বিষয়ক এক বুর্জোয়া শৃঙ্খলা।' এই বিশৃঙ্খলার উৎস ছিলো আসলে অনন্যর অস্তিত্ব সংক্রান্ত বিষণ্নতা ও বিস্ময়ের সার্বিক জিজ্ঞাসায়। যা তাঁকে আজীবন তাড়িত করেছে। এই উৎসভূমিতে দাঁড়িয়ে থাকা কবি তাই বলতে পারেন—'বেঁচে থাকা মানেই অন্ধ শূন্যতার থেকে উদ্ধিত হওয়া স্বেচ্ছায় নিজেকে আবিষ্কার করা।' কবির আত্মবয়ান থেকেও আমরা টের পাই সেই ধনাত্মক স্বপ্নভূমের—

আমি ছিলাম, আমি থাকবো, আমি আছি
আমি আছি পদ্মের জ্বলন্ত সিংহাসনে
কর্ণসুবর্ণের অন্ধকারে, বাতাসের নিতিদ্র চিৎকারে
আমি ঘুমিয়ে আছি কাঠবিড়ালি ও রেলশ্রমিকের শার্ট–পাজামার তলায়
কেয়াপাতার কান্নায়, ধানক্ষেত, ব্রুকলিন ব্রিজ, বিস্রস্ত উপসে,
...
আমি সংখ্যাতীত মানুষ ও সমবেত জ্বলন্ত একক
অঙ্কের ইমাগো; আমি
ঘুমিয়ে আছিবাঁজা সময়ে স্মৃতিগর্ভে

... তুমি আমাকে নবজন্ম দাও; তোমার
শুকনো পোশাক, সংবিধান ও মাছটাকে ছুঁড়ে দাও জ্বলন্ত ডাস্টবিনে
কাগজ ও কমলালেবুর খেতলে দাও হৃৎপিণ্ডের নিচে, দেখবে?
গোলাপের ঘ্রাণ ছিঁড়ে উঠে আসছে পাক না ত্রুটি, পৃষ্কণ মৌমাছি
পদ্মের করাত।
(আমি ছিলাম, আমি আছি, আমি থাকবো)

অথবা তাঁর সাক্ষাৎকারে (*কবিতা-দর্পণ*, ১৯৮৪) বলেছিলেন—'আমি জ্ঞানবিজ্ঞান ও শিল্পের ক্ষেত্রে জাতীয়তাবাদ মানি না।' আবার ক্ষোভও জানিয়েছিলেন—'আসলে বাংলা ভাষায় দার্শনিক, বৈজ্ঞানিক ও অন্যান্য মননশীল বিষয়ের পরিভাষার বড্ডো অভাব।' তাঁর কবিতায় তাই হয়তো আমরা খুঁজে পাই অজস্র ধ্বনি, শব্দ ও বাক্যবন্ধকে যা বাংলা ভাষার পাঠকের অভিজ্ঞতাতে ছিলো না। একেবারে নতুন উচ্চারণ। এমন অনেক লাইন আমাদের সামনে অনন্য রাখলেন যা নিছক চমক বা গিমিক না, এক নিখাদ অনন্য উচ্চারণত

ক) সমস্ত শরীর ছেয়ে মাকড়শার অদংক্য হিংসুক ধূসরতা।
খ) হে প্লাজমার আঠালো মাংসের ফুটেরে সুড়ঙ্গ
গ) অমরত্ব মানেই হচ্ছে রৈখিকের মসৃণ লণ্ডভণ্ড করা
ঘ) ক্লস্ট্রো পুঞ্জীভূত চুল্লি।
ঙ) শ্রম মাইটোসিসে সমাজের কোটি কোটি কীটাণু দুষণে অতিক্রান্ত ক্লীব
কীট ট্রয়ের শূন্যতা।
চ) কোষ্য বশ্য নিসর্গের সুস্বাদু মেশিনরতিতন্ত্র?
ছ) মাংসের ফাটল দিয়ে দ্যাখা যায় তুঁতে নীল স্ক্সমোবানোর
জ) এমন ...প্রভু হে কোথায় যাব? শাটল-ককের ভিক্ষুবেশে?
ঝ) শিশুর কান্নার শব্দে জাগে শুদ্রানির সূর্যে প্লাসাই-ভ্যুস্যতে ভালবাসা।

এরকম অজস্র অনন্য সৃষ্টির উল্লাসে মজে থাকা অনন্যর চলে যাওয়াটা বড় তাড়াতাড়ি হয়ে গেছে, আজকের বাংলা কবিতার আঙ্গিক, ভাষা শুধু নয়, নির্মাণে, দর্শনেও একটা ব্যাপক বদল ঘটাতে চেয়েছিলেন অনন্য। এই কাজে তিনি সফল, তার স্থায়ীত্ব যদি আরও কিছুকাল হতো তাহলে ঘটে যেতো আসল পরিবর্তন, যে প্রচেষ্টা তাঁর ছিলো।

অনন্যর আহ্বান ছিলো 'রৈখিকতার মসৃণতা লণ্ডভণ্ড করার' এই লণ্ডভণ্ড করার পীণাকপাণিই শিঙ্গা ফুঁকেছিলেন *আলোর অপেরার*। সময়ের অন্তর্বয়ানে যা হয়ে উঠেছিল হননের আয়োজন থেকে ক্রমশ আত্মহননের ধারাভাষ্য।
এখন এই মুহূর্তে এই অগোছালো আলোর অপেরার আত্মআবর্তনের শেষে, আমি বিবস্ত্র, পরাজিত, নিঃস্ব, অমরতাপ্রার্থী জুয়াড়িততাই স্বধর্ম আমার ক্রমাগত আত্মহত্যা...'এসো আমরা মৃত্যুকে সেবন করি। অন্ধকার সমুদ্রে স্নান করি আবার অজানা কোন অগ্নিশিখায় পবিত্র হোক আমাদের রক্তাক্ত বেদনা। এই চেতনা এই তৃষ্ণা এই অতৃপ্তি।

অরুণেশ ঘোষ : এক দলছুট বিপথিক কবি

কচুরিপানা, থৈ থৈ জল থেকে মাথা উঁচু করে থাকা ধানগাছ, দূরে বাঁশ ও কলাগাছের জমাট সবুজ ঘেরা পুকুর, একবুক জলে নেমে স্নান করছেন কবি। *কবিসম্মেলন*–এর ২০০৯–এর মে সংখ্যায় অরুণেশ ঘোষের এমনই একটা অসাধারাণ ছবি ছাপা হয়েছিল 'স্নানের আনন্দে কবি'। ঐ পুকুরেরই জলের গভীর থেকে কবির নিথর প্রাণহীন দেহটি তুলে আনা হল আজ, ২৩ আগস্ট, ২০১১, বুধবার, মধ্যদুপুরে।

কোচবিহার শহর থেকে কিছুটা দূরের, ঘুঘুমালি গ্রামের এই পুকুর ছিল তাঁর বাড়ির পাশেই, নিত্যদিনের স্নানের সুখ। শিক্ষকতার কারণে যে হাওয়াগাড়ি গ্রাম ছিল তাঁর দীর্ঘদিনের আস্তানা বছর দশেক হল সেখান থেকে উঠে এসেছেন তিনি এই কোচবিহার থেকে মাথাভাঙাগামী পিচ রাস্তার থেকে পায়ে হাঁটা দূরত্বের ঘুঘুমালির বাড়িতে। ১৯৪১ থেকে ২০১১, এই সাত দশকের *জীবনের জার্নাল* তাঁর হাওয়াগাড়ি ও ঘুঘুমালিকে ঘিরেই। আনন্দবাজার পত্রিকায় 'ভূমিপুত্র' কলামে ২০০৯–এ লিখেছিলেন 'জন্মভূমি থেকে যে দূরে বিদেশে থাকে, তার একটা হাহাকার থাকে জন্মভূমির জন্য। যেমন ছিল নীরদ সি চৌধুরীর। বিদেশে বিস্তীর্ণ জলাভূমি দেখে তিনি উদ্বেল হয়ে উঠতেন বাংলার জল ও প্রকৃতির কথা ভেবে। ...যে জন্ম থেকে জন্মভূমিতে, হয়তো মৃত্যুও হবে সেখানে, তারও একটা প্রগাঢ় বেদনাবোধ থেকেই যায়। জন্মভূমির ঋণ সে শোধ করতে পারল না বলে। ...আমার মতো নগণ্য একজন সৃষ্টিশীল মানুষের যে এই আর্তি বেশি করেই থাকবে তা স্বীকার করতে আজ আর কোন লজ্জা নেই। এখানে জন্ম, এই জল–হাওয়ায় মানুষ, এই জীবনধারা থেকে রস শুষে নিয়েই শৈশব থেকে কৈশোর, কৈশোর থেকে যৌবন কিন্তু একটু বোধ–বুদ্ধি হতেই মনে মনে ঘুরে বেড়িয়েছি ইউরোপীয় ক্লাসিক ও আধুনিক সাহিত্যের অলিতে গলিতে।' উত্তরবাংলার এক প্রত্যন্ত গ্রামের প্রাথমিক স্কুলের শিক্ষকের হাত ধরেই আধুনিক সাহিত্যেও একটা তীব্র উল্লম্ফন ঘটে গিয়েছিল এখানে। যিনি লিখেছিলে, 'আমি শুনি সেই মানুষের আদিম আওয়াজ শিশুর প্রতি মায়ের এক দুর্বোধ্য হাম্বা রব। মানুষের প্রতি মানুষের পশুর করুণ চোখ তুলে তাকিয়ে থাকা, তখনও এই ভাষার মধ্যে শব্দের মধ্যে অক্ষরের গভীর গহ্বরে সেই অতৃপ্তি, অতৃপ্তির বেদনা, যন্ত্রণা আকুলতা ও উন্মাদনা—যা থেকে শুরু হয়েছিল, তা আজও বহমান বলেই ভাষা সজীব ও গতিশীল। সেই পরম ভাষা–ভাষার সম্পূর্ণ মুক্তি হয়তো কোনোদিনই পাবো না, কিন্তু সেই মুক্ত ভাষার দিকেই আমাদেও যাত্রা ...।' *দ্যোতনা*, (২৮ বর্ষ সংখ্যা) অরুণেশের হাত ধরেই উত্তরের থেকে মুক্ত ভাষার খোঁজে নব্য প্রজন্মেও অভিযাত্রা শুরু হয়েছিল, যা সময়ের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছে।

ছোটোবেলায়, জীবনের প্রথম যে কবিতাটি অরুণেশ লিখেছিলেন তাঁর নাম ছিল 'মৃত্যু'। পরবর্তীতে 'শার্ল বোদলেয়ার : জীবন ও জীবনের পথ' শীর্ষক প্রবন্ধে তিনি লিখেছিলেন, 'পুণ্যর পথ নয়, পাপের পথই জীবন্ত পথ, সেই দূর কৈশোরে প্রথম যখন ছিটকে পড়লাম মৃত্যু–উত্তপ্ত–জীবনধারায়, অপরিশীলিত অনুভূতি দিয়ে বুঝলাম, গন্ডিবদ্ধ জীবনের অসারতা থেকে একবার যারা বাইরে এসে এই জীবনের স্বাদ পেয়ে গেছে—জীবন নয়, মৃত্যুর স্বাদ, তার পক্ষে আর ফেরা সম্ভব নয়।' অরুণেশ জীবন ও মৃত্যু দিয়ে যেন এই কথাটি প্রমাণ করে গেলেন।

জন্মেছিলেন ওপার বাংলার ময়মনসিংহ–এ, ১৯৪১–এর ২৯ ডিসেম্বর। দেশভাগের সময় চলে আসেন কোচবিহারের হাওয়াগাড়িতে, জীবনের অধিকাংশ সময় এখানেই কাটিয়ে দেন। শিক্ষকতার সূত্রে এলাকার মানুষের প্রিয়জন ছিলেন 'অরুণ মাস্টার'। যৌবনে এখানেই ঘনিষ্ঠতা হয় কমিউনিস্ট পার্টির কর্মী নিরঞ্জন দত্ত–ও সঙ্গে এবং এই সূত্রেই পার্টির সঙ্গেও তৈরি হয় যোগসূত্র। এই নিরঞ্জনবাবুর হঠাৎ আত্মহত্যা তাঁকে বিধ্বস্ত করে দেয়। পরবর্তীতে পার্টি থেকেও সওে আসেন তিনি। সাহিত্য ও শিক্ষকতা তাঁর জীবনযাপনের শর্ত হয়ে ওঠে। তাঁর কাছে 'লেখার বিষয় হয় মানবজীবনের বা প্রাকৃতজীবনের পুঁতিগন্ধময় তুচ্ছাতিতুচ্ছ বিষয়। সমাজকে নিজেকে আর সভ্যতা যে ভাঙে বা ভাঙছে তারই এমন অনুভূতি অভিজ্ঞতা হওয়া স্বাভাবিক। মানুষ সবময়ই যুক্তির বাস্তবের সামাজিকতার একটা মুখোশ পরে থাকে...। ভেতরে ভেতরে সবাই কবি, সবাই বিদ্রোহী।'

আশির শুরুতে এক চৈত্রের খর দুপুরে গায়ের কাটার বিকাশ সরকারের বাড়িতে হাতে এল একটা ছোট্ট আকারের কবিতার বই, *শব ও সন্ন্যাসী*। বিকাশের বালিশের নীচে, ওর ভাষায় 'নতুন কবিতার গীতা'। সতেরো বছরের দুই কিশোরের কাছে ঐ কবিতাদগ্ধ দুপুর এক স্থায়ী অভিঘাত রেখে যায়।

সৌরজগতের সুতোর মতো কালো রাত্রির ছায়াপথ
সেখানেও মেলে রাখা হয়েছে আধিভৌতিক শাড়ি
কোন নগ্নতার ? হাঁটুতে মুখ গুঁজে কোন ঈশ্বরী ...
(হেমন্তকাল, শব ও সন্ন্যাসী)

এ যেন বারুদের গন্ধ পথ চিনিয়ে নিয়ে আসে শিকার আর শিকারিকে, তবুও জন্মান্ধ দিগন্তজোড়া মরুভূমির উপর বুক খুলে বসে থাকে অন্ধ শহর, আকাশের দিকে চেয়ে, তীব্র বিদ্রুপে খানখান হয়ে ভেঙে পড়ে যাবতীয় আধ্যাত্মিক ও ঐশ্বরিক সত্যের বিভা।'

প্রতিটি মধ্যরাতে তোমাকে পেরুতে হয়
নরক ও নক্ষত্রলোকের নদী, কোথায় স্পষ্টতা?
হেসে, বাঁ হাতে সরিয়ে দাও সব হা–হাস্যকর
শুধুই একটি আঙুলে স্পর্শ করে মাটি।
(শব ও সন্ন্যাসী)

এই কবিতার টানেই এক বর্ষণমুখর দিনে বিকাশ ও আমি হাজির হয়েছিলাম হাওয়াগাড়ির ঐ আস্তানায়। সেদিন থেকে মাথার উপর জ্বলন্ত তারার মতো তাঁকে রেখে পথ খুঁজে বেড়ানো আমাদের। সেদিন অরুণেশ পড়তে দিয়েছিলেন লোকনাথ ভট্টাচার্য অনূদিত র‍্যাঁবোর কবিতার বই *নরকে এক ঋতু* ।

এর দেড় দশক পরে, ১৯৯৫ সালে অরুণেশ নিজেই প্রকাশ করেন র‍্যাঁবোর কবিতার অনুবাদগ্রন্থ *মাতাল তরণী*, মুখবন্ধে লেখেন, 'র‍্যাঁবোর অসামান্য ভিশানের সঙ্গে আমার অধমতার এক সংমিশ্রণ এই গ্রন্থভুক্ত চব্বিশটি কবিতা।' বইটি আমাকে উৎসর্গ করেন, সঙ্গে সুব্রত রায়, তিন বছর আগে সুব্রত আত্মঘাতী হয়ে চলে গেছে। খুব শীঘ্রই বইটির ২য় সংস্করণ বের হয়, তাতে অরুণেশ লেখেন 'কেউ কেউ মৃত্যুর গর্ভে নতুন করে জন্ম নেন, প্রকৃত–মৃত্যুর পর শুরু হয়, র‍্যাঁবো তাদেরই একজন।

নব্বুইয়ের কোনো এক শ্রাবণের সন্ধ্যায় কবির নতুন ঠিকানা ঘুঘুমালির বাড়িতে রণজিৎ দাশ ও আমি যাই। মাথাভাঙা থেকে সুব্রত রায় সেখানে আমাদেও অপেক্ষায় ছিল। রণজিৎ দাশ সেই ভ্রমণশেষে একটা গদ্য লেখেন, 'একটানা পাটপাতার গন্ধের ভিতর দিয়ে শ্রাবণ মাসের দীর্ঘ রাস্তা পেরিয়ে আমরা যেখানে এলাম সেটি অ–এ অজগর চিহ্নিত সীমান্তের শেষ প্রচ্ছন্ন আউটপোস্ট। ...আপন মেজাজেই এটি গজিয়ে উঠেছে, লোকচক্ষুর আড়ালে, নদীর চরের মতো। ...যেখানে এসে নামলাম সেটি আহ্বায়ক মাস্টারমশাই'র প্রান্তিক কার্যালয়, জিরাফ, জলকাদা, পিতৃতন্ত্র, গণিকালয় এবং সন্তদের রাত্রি নিয়ে তাঁর ব্যক্তিগত তাঁবু।' অরুণেশ ছিলেন এমনই এক সেনাপতি যিনি সরাসরি সভ্যতার দিকে আঙুল তুলে বলতে পারেন—

আমি তোদের ঘেন্না করি, চাই না আমার অচৈতন্যে সঞ্চিত
নিস্পৃহ আবার–
তোদের পুষ্টি জুগিয়ে চলুক, তোরা পালক ঝরে যাওয়া
মৃত পাখির ঝাঁক।

জলপাইগুড়ি শহর থেকে বিজয় দে সম্পাদিত *পাগলাঘোড়ায়* কবির প্রোফাইলে পুলিশ সংক্রান্ত এক জিজ্ঞাসার উত্তরে অরুণেশের দেওয়া জবাব নিয়ে তোলপাড় হয়ে যায়। ব্যারাকপুরের পুলিশ শিবির থেকে মুখোমুখি হলে পুরুষত্ব দেখিয়ে দেওয়ার হুমকিপত্র আসে। কিন্তু সম্পাদক বা কবি এই খাকি হুমকিতে ভয় পান নি।

হাথরি আন্দোলনের সঙ্গে অরুণেশের যোগাযোগ একসময় উত্তরেও আলোড়ন ফেলেছিল। বস্তুত তাঁর এই উদ্যোগেই *হাথরি*রও অন্তিম শিবির ছিল এই প্রান্তিক শহর। এ সময় তাঁর সম্পাদিত *জিরাফ* নিয়মিত প্রকাশ হচ্ছে। এই মতেরই পথিক জীবতোষ দাসের *রোবট*, শিলিগুড়ি থেকে রাজা সরকার, কিশোর দাস, অলোক গোস্বামীদের *কন্‌সেন্ট্রেশেন ক্যাম্প*, মনোজ রাউথের *ধৃতরাষ্ট্র*, *মাথাভাঙা*র কমল সাহা, অনুভব সরকারদের *টার্মিনাস*, গায়েরকাটা থেকে বিকাশের *থাবা*, আলিপুরদুয়ার থেকে দিবাকরের *দ্রোহ*, ধূপগুড়ির অন্যমন দাশগুপ্তর *বুদ্ধদেব*ত এরকম প্রচুর তরুণ কবি সম্পাদকের বিদ্রোহী আত্মার তুলকালাম চলছে উত্তরে। ফাল্গুনী রায় থেকে গেলেন কিছুদিন, সুভাষ ঘোষ, শৈলেশ্বর ঘোষ, অরুণ বণিক, বাসুদেব দাশগুপ্ত থেকে নিত্য মালাকার, সমীরণ ঘোষ—এক শক্তিশালী সেনাবাহিনি যেন ভাষার ভিন্নমুখ নির্মাণে তোলপাড় করতে থাকলেন। নেতৃত্বে সেই মৃদুভাষী, ধুতি–লুঙ্গি পরা স্কুল শিক্ষক অরুণেশ ঘোষ। এখান থেকে ফিরে ফাল্গুনী তাঁর শেষ কবিতা 'কবিতা দেখা' লিখলেন—'প্রকৃত সংস্কৃতিকে যথার্থই ধ্বংস করে/আর উল্লুকের বাচ্চাদেও মতো হারিংদেও বলে মাতাল, অশ্লীল, গেঁজেল/ তখন সত্যি বলছি জীবতোষ/ ...মৃত্যুর হলুদ রঙের চোখ/চোখ রাখছে আমার ওপর।'' ...এই মৃত্যুকে নিয়েই অরুণেশ আজন্ম সৃষ্টিতে জুড়ে ছিলেন।

আমার আমি, স্বপ্ন দেখি অনেক দূরে বিপথে
রোমান মৃত নক্ষত্রের গায়ে হাত রেখে স্থির হয়ে বসে আছে

হয়ত তার মৃত্যু হবে আমার মৃত্যুও অনেক আগে
হয়ত আমিই মরে পড়ে থাকব তার বিপথের পাশে।
(বিপথিক)

শব ও সন্ন্যাসী থেকে সাম্প্রতিক সময়ের বই 'পশুরাও অন্তর্লীন হাসে' কবিতা, গদ্য, প্রবন্ধ মিলিয়ে ১৯টি বই রয়েছে অরুণেশের। ১৯৮১–তে *শব ও সন্ন্যাসী*র দুবছর বাদে অপরাধ *আত্মার নিষিদ্ধ যাত্রা*, ১৯৯৫–তে র‍্যাঁবো–ও কবিতার ভাবানুবাদ *মাতাল তরণী*, ১৯৯৮–তে *বর্বরের তীর্থযাত্রা*, প্রবন্ধের বই *জীবনানন্দ* ছাড়াও 'কবিতার অন্ধকার যাত্রা', *জীবনের জার্নাল* প্রভৃতি গ্রন্থকাওে প্রকাশিত বইয়ের বাইরেও বিভিন্ন লিটল ম্যাগাজিনে রয়েছে তার অন্যান্য প্রবন্ধ ও কবিতা। তাঁকে ঘিরে অনুষ্ঠান হয়েছে, প্রাতিষ্ঠানিক কোনো সম্মানের তোয়াক্কা না করা এই উল্টোপথের পথিক মানুষটিকে গত বছর শিলিগুড়িতে 'সৃজন উৎসব'–এর পক্ষ থেকে 'সৃজন' সম্মান দেওয়া হয়। পূর্বে তাঁকে *দ্যোতনা* এবং বিকল্প সংবর্ধিত করেছে। অরুণেশ লিখেছিলেন, 'বছরের একটা সময় আকাশ ঝকঝকে পরিষ্কার হয়, উত্তরের পর্বতমালা এক রাত্রিতেই একশ মাইল ছুটে এসে তোর্সার তীর জুড়ে বিশাল হয়ে দাঁড়ায়। যেন জলেই নেমে পড়েছে কালো ধূসর জীবন্ত পর্বত–শরীর, হিমালয় স্নান করছে তার ক্ষীণতোয়া আত্মজার নীলাভ জলেই। ... ভোরবেলা এক ঘণ্টা হাঁটলেই বুঝি পৌঁছে যাব তার সোনালি জঙ্ঘার কাছে, ছুঁতে পারব তাকে—একা আমি হাঁটতে থাকি তার দিকে। তখনই মনে হয়, অনেক কাজই বাকি রয়ে গেছে, ঋণ শোধ হয় নি আমার। ...দুটো বা তিনটে সত্তা আমার মধ্যে, এখানকার মাটি থেকে রস শুষে নিয়েও ইউরোপের আকাশে আকাশে ওড়া—এটাও স্বাভাবিক, শিল্প ও সাহিত্য। আর এটাই তো তখনকার বিশ্বভাবনা।' এই বিশ্বভাবনা গ্রন্থিত জীবনের জার্নাল থেমে গেলে এক বর্ষাভেজা দুপুরে, এক মহাশূন্যতার মুখোমুখি দাঁড় করিয়ে চলে গেলেন রণ–রক্ত–সফল বস্তুপৃথিবীর এক দলছুট 'বিপথিক' কবি, অরুণেশ ঘোষ।

জাঁ আর্তুর র‍্যাঁবো : উন্মাদ সৌরকণা

২৮ আগস্ট, ১৮৭০। প্যারি স্টেশনে গ্রেপ্তার হলেন ১৪ বছরের এক কিশোর। বিনা টিকিটের যাত্রী। কপর্দকহীন, ঠিকানাহীন। সাতদিনের জেল হাজত। এই কিশোরকে সে–সময়কার পুলিশের কর্তারা চিনতে পারেন নি, তবে তৎকালীন ফরাসি সাহিত্যের প্রাণকেন্দ্র প্যারির অনেক ডাকাবুকো কবি–সাহিত্যিকের কাছেই, ১৬ বছরের সে এক অশান্ত ও নষ্ট ছেলে। গোটাজীবন যিনি অশান্ত ঝড়ের মতো ছুটে বেড়িয়েছেন সেই র‍্যাঁবোর এটাই ছিল প্রথম 'বাড়ি থেকে পালানো'।

জাঁ আর্তুর র‍্যাবো, ১৫৫৮ থেকে ১৮৯১, মাত্র ৩৭ বছরের জীবনে এই অশান্ত যুবক ইউরোপ–আফ্রিকার নানা জায়গায় ঝড়ের মতোই দামাল হওয়ায় ছুটে বেড়িয়েছেন। যাকে তৎকালীন ফরাসি সাহিত্য করেছিল 'নাস্তিক, দার্শনিক ও চিরকালের অভিশপ্ত আত্মা' বলে। প্রথম বাড়ি থেকে পালিয়ে সে–যাত্রায় স্কুল ছাত্র র‍্যাঁবো সাত দিনের অন্ধকার কুঠুরিতে চিনলেন আরও এক নরকে। এই নরমুক্তির আর্তি জানিয়ে চিঠি লিখলেন প্রিয় শিক্ষক, বন্ধু ও পথপ্রদর্শক ইজামবার্গকে। জেল থেকে মুক্ত হয়ে সোজা হাজির তাঁরই কাছে। থাকলেনও বেশ কিছুদিন। তারপর সেই ১৬ বছরের স্কুলছাত্রটিকে ইজামবার্গ পৌঁছে দেন মায়ের কাছে। কিন্নতু গোটা জীবনই যাকে পথে–পথে পথ অন্বেষণে ছুটে বেড়াতে হবে তাকে 'রুধিবে কোন বন্ধন'? আবার বাড়ি থেকে পালালেন র‍্যাঁবো, ৭ অক্টোবর।

সেটা প্যারি কমিউনের যুগ, ১৮৭০–৭১। প্যারির পথে হেঁটে উস্কোখুস্কো চুল, ছেঁড়া জামা–প্যান্ট পরা ১৬–১৭ বছরের এক ভবঘুরে সুদুর শার্লভিল থেকে হেঁটে আসছেন। মুখে জ্বলন্ত চুরুট, সেই আগুনের পাশে যেন পাল্লা দিয়ে জ্বলছে দুই চোখ। ১৮৭০ থেকে

১৮৭০২ Sensation বা সংবেদন, Roman বা প্রেমাভিযান, Ma Bohime বা ফ্যান্টাসির মতো কবিতা লিখে ফেলেছেন। ইতিমধ্যে ভের্লেনকে পাঠিয়েও দিয়েছিলেন বেশ কবিতা, যার মধ্যে ছিল উন্মাদ তরুণ লেখক ফিলিপের বাতি, শার্ল ব্রস ও লিঁয় ভালদেকে পড়ালেন শালভিলের তরুণের কবিতাগুলো। তাকে তারা প্যারি শহরে আমন্ত্রণ জানলেন, সঙ্গে ট্রেন ভাড়াও পাঠিয়ে তাড়াতাড়ি চলে আসতে লিখলেন। ১৮৭১-এর সেপ্টেম্বরে র‍্যাঁবো প্যারি এলেন। স্টেশনে তাকে স্বাগতম জানাতে হাজির স্বয়ং ভের্লেন ও শার্ল ব্রস। কিন্নতু কেউ কাউকে চিনতে পারলেন না, ফলত, র‍্যাঁবো একা-একাই হেঁটে চলে এলেন ঠিকানা ধরে ভের্লেনের শ্বশুরবাড়িতে, মমার্ত পাড়ায়। ছেঁড়া জামাকাপড়, উস্কোখুস্কো চুল, নোংরা বাচ্চা ছেলেটাকে দেখে চমকে ওঠেন ভের্লেনের স্ত্রী মতিলকে। এই কি ফরাসি সাহিত্যর নতুন প্রতিভা!

র‍্যাঁবোর অধিকাংশ লেখা ১৮৭০-এ শুরু ১৮৭৪-এ শেষ। এর মধ্যে প্রায় ৮০ টিতে গোটা সাহিত্যবিশ্বকে এক দীর্ঘস্থায়ী ধাক্কা দিয়ে যান তিনি। 'র‍্যাঁবো'-র জন্মশতবর্ষের লোকনাথ ভট্টাচার্য অনুদিত *নরকে এক ঋতু* 'নাভানা' থেকে বের হয়েছেছিল। লেখক-অনুবাদক লিখেছিলেন ''এই প্রথম তাঁর শতবার্ষিকী উপলক্ষে একটি সম্পূর্ণ বইয়ের অনুবাদ প্রকাশিত হচ্ছে। তাই এক অর্থে বাংলাদেশেও তার শতবার্ষিকী অনুষ্ঠিত হল। জানি না ফ্রান্স ও অক্সফোর্ড ছাড়া পৃথিবীর আর কোন প্রদেশে তা অনুষ্ঠিত হয়েছে বা হতে চলেছে। বাংলাদেশের পক্ষে এটা কম গৌরবের কথা নয়। অন্যভাবে বলতে গেলে আবার, এতে গর্ববোধ করা উচিত সমস্ত ফরাসির।'' *কবিতা* পত্রিকার জীবনানন্দ স্মরণ এর পঞ্চাশ বছর পরেও, র‍্যাঁবোর দেড়শ বছরে ২০০৪-এ বাংলায় র‍্যাঁবো-চর্চার ব্যাপকতা এই গর্বকে আরও বড় করে দেয়। সাঁইত্রিশ বছর রয়সে র‍্যাঁবো মারা যান, এরপর থেকে অদ্যাবধি অজস্র বই অনুবাদ, সমালোচনায় তিনি থেকেছেন প্রবল পরাক্রমে, তবুও আজও তাঁর সম্পূর্ণ উন্মোচন হয় নি। র‍্যাঁবো স্বতন্ত্র, আর্দ্রে ব্রেঁতোর ভাষায় 'কৈশোরের মূর্তিমান দেবতা' আলবেয়ার কামুর ভাষায়, ''সর্বশ্রেষ্ঠ কবি, বিদ্রোহির কবি, রেনে শাঁ-র ভাষায় যে সভ্যতা জন্মায় নি তখনও তার প্রথম কবি র‍্যাঁবো জ্যাক রিভিয়েরের মতে—একটা বজ্জাত ও ভয়ঙ্কর শিশুর শরীরের ভেতর সবচাইতে ইচুমার্গের একটা চেতনা ও চৈতন্যের আবাস। র‍্যাঁবোর নৈরাজ্যবাদী বানানোর কাজটা প্রবলভাবে হলেও আমি অনেকের মতো আমিও ভিন্নমত পোষণ করি। পারিপার্শ্বিক অবস্থা সম্পর্কে তাঁর স্বতন্ত্র ধ্যানধারণার পরিচয় বহন করে। তাকে একটা পছন্দমত চেহারা দেওয়ার জন্য যে রূপকথাগুলো গড়ে উঠেছিল সত্য- মিথ্যা কল্পনার মিশ্রণে তার পেছনেও এই সমস্ত প্রতিষ্ঠানের ভূমিকা নিছক কম নয়। তার যৌনজীবনের যাপনকথা নিয়ে যে—'রূপকথা' তৈরি হয়েছে তাকে চ্যালেঞ্জ করে বোন ইসাবেলের জিজ্ঞাসা: এটা কী করে সম্ভব যে ১৫-১৬ বছরের একটা কিশোরের বদমায়েশির মাত্রা ও ক্ষমতা এতই যে সে তার চেয়ে এগারো বছরের বড় ভের্লেনকে চরিত্রহীন করে ছাড়লো। র‍্যাঁবোর শেষ জীবনের রোগক্ষত, ক্যান্সার পা কেঁটে বাদ দেওয়ার সঙ্গে যৌনরোগের অনুষঙ্গ জুড়ে দেওয়া হয়। কিন্নতু যে মানুষটা তাঁর মাতৃভূমির প্রবল রাজনৈতিক ঘটনাক্রমকে প্রত্যক্ষভাবে দেখেছেন, প্যারি কম্যুনের সময় পায়ে হেঁটে প্যারি পৌঁছেছেন। স্বাধীনতা, গণতন্ত্র বুর্জোয়া, রাজতন্ত্রের প্রসঙ্গ নিজের উচ্চারণের স্বাতন্ত্র্য বীক্ষার চিহ্ন রেখেছেন। এহেন কবির ব্যক্তিজীবনকে বিকৃত যাপনকাহিনির রহস্যগাথায় মুড়ে রাখাটা নিছকই নির্দোষ চর্চা নয়। যিনি লিখেছিলেন—

এই মনোহর শ্রমিকদের জন্য
ব্যাবিলনিয়ার অধীশ্বরের দাস হয়ে থাকা যারা,
ভেনাস, তোমার সাথীদের ত্যাগ করো কিছুক্ষণের জন্য
যাদের হৃদয় মুকুট কিছুই চেনে না,।
এই শ্রমিকদের জন্যে রাখাল রাণি
আলো ভরে আনো জীবনরসের পাত্র কানায় কানায়-
ওদের শক্তি শাস্তিতে পাক বাণী

অথবা,

রাষ্ট্রের প্রধান জায়গাগুলোতে আমরা বানাবো,পুষ্টি করবো
বিশ্বনন্দিত বেশ্যালয়, নির্দয়ভাবে হত্যা করবো যুক্তিসম্মত বিদ্রোহ।
টক-ঝাল উগ্রগন্ধে ও প্রচুর মদের ফোয়ারায় মত্ত এই দেশ
আজ বিপুল শোষণ: শিল্পে ও সামরিকে

অথবা,

আমার, লোভী ও নপুংসক উত্তরপুরুষ
রাজণ্ডের স্বর্ণলোচন, তার স্বরে আজ পাল্টে গেছে সব কিছু।

অথবা,

রুমালের গিট খুলে একটা স্বর্ণমুদ্রা মেলে ধরলেই
ঈশ্বর জেগে ওঠেন।

হেনরি মিলার তাঁর *টাইম অব দি অ্যাসাসিনস*–এর ভূমিকায় লিখেছেন কবির সামাজিক সংস্থা এবং তার অবস্থানের যে রকমটা (আমি এই শব্দগুলি একই সঙ্গে প্রসারিত ও সংক্ষিপ্ত অর্থে ব্যবহার করছি) তা যে–কোনও মনুষ্যসমাজের আসল প্রাণবন্ত শক্তিটাকে নিঃশর্তভাবে খুলে দেখায়।...যখন এরকম কোনও মানুষকে বেলচায় করে ময়লা ফেলবার মতো করে চেঁছে ফেলবার সময় এসে পড়ে, তখন আমরা কী পৈশাচিক হুল্লোড়েই না সেই একাকী লোকটার 'সামঞ্জস্যহীনতা'–র ঘোর অপরাধের দিকে আঙুল তুলে দেখাতে থাকি, অথচ এই পঁচে যাওয়া সমাজটায় সেই তা ছিল একমাত্র সাচ্চা বিদ্রোহী। আসলে তো এই মানুষগুলিই ভুল ব্যবহার করে যেতে থাকা সামঞ্জস্যহীনতা' কথাটাতে এরকমভাবে আশ্চর্য তাৎপর্য জুগিয়ে যেতে থাকা। মিলারই লিখেছেন—'আমাদের আগাপাস্তালা আধুনিক হতেই হবে বলেছিলেন র‍্যাঁবো, বোঝাতে চেয়েছিলেন যে, দো–আশঁলা হাঁসজারুরা সেকেলে হয়ে গেছে কুসংস্কার এবং আসক্তি এবং ধর্মবিশ্বাস এবং অন্ধ অবস্থা অনুশাসনে এবং সর্বচারী ক্লান্তিবোধ—যা সবকিছু নিয়ে আমাদের এই দাম্ভিত সভ্যতা তৈরি হয়েছে। আলো আমাদের আনতেই হবে; কৃত্রিম আলোয় আলোকিত করে তোলা নয়।'

আদিম তান্ত্রিক সন্ন্যাসী

জাঁ আর্তুর র‍্যাঁবো, যার কবিতা অনুবাদ প্রসঙ্গে লোকনাথ ভট্টাচার্য লিখেছেন, 'কে এই র‍্যাঁবো? এক কথায় এ প্রশ্নের উত্তর দিতে বিদগ্ধ ফরাসিরাই বিপন্ন বোধ করবেন, আমি তো কোন ছার। তাঁকে কেউ– বা বলেন দানব, কেউ বা বলবেন দেবদূত, কেউ–বা সকল গলা ছাড়িয়ে নিজের গলাটিকে গুনিয়ে বলবেন—দানবও নন, দেবদুতও নন, মরজগতের একজন মানুষ মাত্র। জন্মেছিলেন ফ্রান্সের সীমান্তে শহর শার্লভিলে, ১৮৫৪ সালে ২০ অক্টোবর। অর্থাৎ অঙ্কের হিসাবে দেড়শো বছর অতিক্রম করেছেন র‍্যাঁবো। ভাষাবিশ্বের কবিতা অঙ্গনে এখনও তিনি অনন্য, আদিম কালের তান্ত্রিক সন্ন্যাসী। ২০ টি কবিতা নিয়ে তাঁর সংকলন posic বেরোতেই হইহই কাণ্ড। তাঁর ভবঘুরে থেকে শক্তি আহরণ ও জীবনবোধ পরিপূরকের ভুমিকায় এখানে। The adventures in replaced the adventure in the ideal; ফরাসি কব্যের সিম্বলিজম এবং স্যুররিয়ালজমে উনিশ শতকের সাহিত্যের ও শিল্পের বিস্তীর্ণ ক্ষেত্রে এক নতুন আলোর ঝলকানি। আরি আপলিনিয়ের, ক্লোরেফ থেকে ককতোর নগ্ন কবিতা, তারপর অডেন স্পেন্সারের কবিতার নতুন উন্মোচন। পাঠেকর কল্পজগৎ ও বাস্তবের সীমারেখা এলোমেলো করে তাকে সে রহস্য ও কল্পবাস্তবের মধ্যে নিয়ে যায়। এ যেন আপাত অর্থহীন জগতের সামনে দাঁড়িয়ে বা সীমারেখাকে হুমকি দেওয়ার অনুভুতি। শিল্প সম্পর্কের প্রাচীনবোধ ও ধারণার প্রতি যুদ্ধ, ও বিদ্রোহ। আমরা এই আক্রোশের অস্থির উচ্চারণ র‍্যাবোর স্বল্পসময়ের কবিজীবনের প্রতিটি সৃষ্টি শুনতে পাই।

র‍্যাঁবো সম্পর্কে এখানে হেনরি মিলারের চিত্রণ—র‍্যাঁবো আমার কাছে একজন 'পার এনে ক্রমবিবর্তমান কবি। এই বিবর্তনের মধ্য দিয়ে র‍্যাঁবো। তাঁর প্রথম অর্ধেকটা জীবন অতিক্রম এটা পরবর্তী অর্ধেকাংশের জীবনের তুলনায় বিশ্ময়কর। আমরা এই অংশের র‍্যাঁবো সম্পর্কেসচেতন নই যখন তিনি পরবর্তী অংশে প্রবেশের প্রস্নতুতি নিচ্ছিলেন। আর এই বিরাট বিপদের সামনে এসে তিনি দিগন্তসীমার নীচে ছিলেন। এই সব মানুষ যুদ্ধ জারি রাখে, মনে হয় এই পৃথিবী তাঁদের স্বভাবের সবচাইতে গূঢ় কিছু তত্ত্ব প্রকাশ করার যুদ্ধ জারি রাখার জন্যই। এরা ধরতাইটার সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে জুড়ে থাকেন, থাকেন জুড়ে থাকেন সেই সব সমস্যার সঙ্গে যারা সময়ের সঙ্গে এটে থাকে সময় সতত পরিবর্তশীল অনুঘটক তার।''

বাবা ছিলেন সেনাবাহিনীর ক্যাপ্টেন ফ্রেডরিক র‍্যাঁবো (Frederic Rimbaud) এবং মা ক্যুফ (Vitali Cuif) গ্রামের সম্পন্ন কৃষককন্যা। পারবারিকভাবে ভীষণ ধর্মভীরু পরিবেশ বিদেশে ঘুরে বেড়ানো ক্যাপ্টেন র‍্যাঁবোর সঙ্গে স্পষ্টবক্তা ও দৃঢ় ভিতালির সঙ্গে বিদেশ থেকে খারাপ হতে শুরু করে। মাত্র ৬ বছরের যখন র‍্যাঁবোর বাবা তাদের ছেড়ে চলে যান চোখ নিয়ে জন্ম নেওয়ার র‍্যাঁবোকে জন্ম থেকেই এর রূঢ় বাস্তবের সঙ্গে যুঝতে হয়েছে। ১৮৬ রোমার স্কুল ভর্তি করা হয় তাকে, ৮/৯ বছর বযসেই তার লেখায় শিক্ষকেররা চমকে ওঠেন বয়সের তার লেখা কিছু এখনও সংরক্ষিত আছে। স্কুলজীবনে এরপরের অধ্যায়ে তার শিক্ষক আসেন জর্জ ইজামবার্গ।স্কুলছাত্র র‍্যাঁবো ১৮৭০ নাগাদ যে সমস্ত কবিতার জন্ম দেন তাদরে তাদের মধ্যে সেনসেশন কবিতাও রয়েছে। এ সময় তাঁর কয়েকটি কবিতা বানভিলকে পাঠিয়েছিলেন সংকলনভুক্ত করার জন্য কিন্নতু এইটুকু বাচ্চার কবিতা সেখানে সংকলিত হয়নি। এর অনেকগুলোই আজ কারোত্তর একটি আফেলিয়া'

নিস্তরঙ্গ কালো জলের উপর সাদা হয়ে ভাসে
আফেলিয়া, যেখানে নক্ষত্রছায়া ঘুমিয়ে থাকে
ধীরে বয়ে চলা ওই, মসরিনের মতো মসৃণ বস্ত্রখণ্ড
দূরে বনে কোথায় মৃত হরিণীর কান্না ভেসে আসে।
সহস্র বছর ধরে সে ভেসে ভেসে চলে, কালো নদ
তাতে শুভ্র এক বিষণ্ন ফুল, আফেলিয়া, যেন এক

শ্বেতবসনা অশরীরী। সন্ধ্যায় রহস্যবাতাস
তার প্রেমমত্ত, রাতের আকাশ তার প্রেমমত্ত
গান গায় গুনগুন করে, সহস্র বছরে ধরে
ওমেগা, তোমাদের দৃষ্টি কাপে নীল কিরণ হিল্লোল।'

১৮৭০–এর ৭ অক্টোবর। র‍্যাঁবো আবার বাড়ি থেকে পালালেন, বেলজিয়ামের দিকে। সাংবাদিক হওয়ার চেষ্টা করলেন। কিন্নতু বিফল ও হতাশ হয়ে আবার বাড়ি ফিলে এলেন। ১৮৭১–এর জার্মানরা শার্লভিল দখল করে। এবছরই ২৫ ফেব্রুয়ারি তাঁর হাতঘড়ি বেচে ট্রেনে চেপে আবারও অনির্দিষ্ট যাত্রা। এলেন প্যারি। কপর্দকহীন অবস্থায় রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়ান। ১০ মার্চ হেঁটে শার্লভিলের পথে ফেরা। ১৩ ও ১৫ মে জর্জ ইজামবার্গ ও পাদদেমেনিরকে এ সময় দুটো খুব গুরুত্বপূর্ণ চিঠি লেখেন র‍্যাঁবো, এখানে শিল্প ও দর্শন নিয়ে তার বক্তব্য তুলে ধরেন। ১৫ মে লেখা তাঁর চিঠির একাংশ– 'একজন কবি তখনই প্রকৃত দ্রষ্টা হয়ে ওঠেন, যখন তাঁর সমস্ত ইন্দ্রিয়ের মধ্যে প্রকাণ্ড এবং যুক্তিতর্কসমন্বিত বিশৃঙ্খলার জন্ম হয়। যখন তিনি কঠিন পরীক্ষার মাধ্যমে খুঁজে পান প্রেমের, যন্ত্রণার, আবেগের, উন্মাদনার সমস্ত প্রবৃত্ত। সব বিষ পান করে রেখে দিতে হবে সারাংশ। বিশ্বাস এবং অমানবিক শক্তির সন্ধানে পেতে হবে অবর্ণীয় যন্ত্রণা। হতে হবে ঘোর অপরাধী, চিররুগ্ণ, পরম নারকীয়, জ্ঞানীদের শিরোমণি। এসবের ফলেই জীবনের অজ্ঞাত রহস্য পৌঁছানো সম্ভব। ফরাসি কাব্যে সিম্বলিজম, পরবর্তীকালের স্যুররিয়ালিজম উনিশ শতকের গোটা বিশ্বসাহিত্যের ও শিল্পের বিস্তীর্ণ ভুবনে এক নতুন 'স্পার্ক'। বোদলেয়ার কবিতাকে ইঙ্গিতময়তার ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত করেছিলেন বটে, তবে তিনিও পররম্পরাগত অনুষ্ঠানের জাল ছিঁড়ে বেরিয়ে ধারণক্ষমতার এটাই বিস্তার ঘটালেন যে, সে মনের সূক্ষ্ম নিয়ন্ত্রণগুলোকে ছিঁড়ে বেরিয়ে ক্ষমতায় আসতে পারেন নি। শব্দকে নিজস্ব শক্তিতে দাঁড় করিয়েছিলেন র‍্যাঁবো। র‍্যাঁবো কবিতার আবহ ও ধারণক্ষমতায় এটাই বিস্তার ঘটালেন যে, সে মনের সূক্ষ্ম নিয়ন্ত্রণগুলোকে ছিঁড়ে বেরিয়ে গেল বিস্তৃত হয়ে। এই যাদু চমৎকারিত্বে কবিতাই সত্তা, কবিতাই সংবেদন। 'ওমেগা' তোমার দৃষ্টি কাঁপে নীল কিরণ হিল্লোলে। এই র‍্যাঁবো সম্পর্কে পল ক্লোদেল লিখেছেন—''যখন ইতিহাস পথভ্রষ্ট, দেশে গৃহযুদ্ধ, মানসিক ও দৈহিক অশান্তি এবং পজিটিভিজমে দেশ সম্পূর্ণভাবে নিমজ্জিত তখন হঠাৎ জেগে উঠলেন 'জোয়ান অব আর্ক'–এর মতো।''

এরপরের অধ্যায় বহু–আলোচিত। র‍্যাঁবো ও ভের্লেন পর্ব। দুজনের বাউন্ডুলেপনায় তিতিবিরক্ত ভের্লেনের স্ত্রী। দৈনন্দিন কলহের থেকে তাঁকে ছেড়ে চলে আসাই শ্রেয় মনে করেন ভের্লেন। যদিও র‍্যাঁবো স্বামী–স্ত্রী ঝগড়ার বিষয় হতে একদমই চাইছিলেন না, ভের্লেনের বাড়ি ত্যাগ করে কিছুদিন পথে পথে ঘুরে বেড়ান তিনি। এ–সময় চাবির রিং– ও ফেরি করেন প্যারির রাস্তায়। মাঝে তিনি প্যারির সংস্কৃতিজগতের বেশ কিছু মানুষের বাড়িতে আশ্রয়ও নেন, কিন্নতু এই খাপছাড়া কিশোরটি কোথাও খাপ খাচ্ছিলেন না। র‍্যাঁবোর সঙ্গে কবিতাভাবনা নিয়েও বিরোধ লাগল লেঁকৎ ফ্যালিলের মতো কবিদের। তাঁদের কবিতার স্থবিরতাকে তীব্র আক্রমণ করেছিলেন র‍্যাঁবো, পালটা হানা দিলেন প্যারির প্রতিষ্ঠিত কবিদল। এই সময় তাঁর পাশে ছিলেন একমাত্র ভের্লেন। কিন্নতু তিনিও ঘরে–বাইরে আক্রমণে বিপর্যস্ত হয়ে যাচ্ছিলেন। ৭ জুলাই ১৮৭২, ভের্লেন সংসার ছেড়ে র‍্যাঁবোকে সঙ্গী করে বেলজিয়ামের পথে রওনা হন। এর মধ্যেই আবার লন্ডনে দুবছর ইংরেজি শেখা। ১৮৭৩–এ র‍্যাঁবো লিখলেন তাঁর প্রধানতম কবিতা jue saison en enfer বা নরকে এক ঋতু—

সেদিন কথা, যতটা মনে আছে– আমার জীবন ছিলো উৎসবমুখর
সেখানে মুক্ত হৃদয় এসে হৃদয়ে মেশে, অনুকূল হয় সুরাস্রোত
এক সন্ধ্যায় দেখা হলো সুন্দরের সাথে আমার কোলে টেনে নিয়ে দেখি
আমারই আঘাতের ক্ষত, তিক্ত সুন্দর
'যুদ্ধ দেহি' বলে ন্যায়কে চ্যালেঞ্জ করলাম
পালিয়েও গেলাম, হায় জাদুকরি! তোমার জিম্মায় আমার যা কিছু সম্পদ,
উজাড় করেছি পরম বিশ্বাসে

পরবর্তী প্রজন্মের লেখক হেনরি মিলার তাঁর The Time of the Assassins–এ লিখেছেন যে, ''এই 'নরকে এক ঋতু' সম্পর্কে র‍্যাঁবো বলতেন তার ভাগ্য ঝুলে আছে এই বইয়ের উপর। এটা যে কতটা সত্য কথা তা র‍্যাঁবো জানতেন।। মানুষের অভিজ্ঞতার সবচেয়ে সংকটময় কালখণ্ডটির সঙ্গে তিনি তার ভাগ্যের অভিন্নতা সনাক্ত করে নিয়েছিলেন।'' মায়ের কাছ থেকে টাকা নিয়ে নিজে প্রুফ দেখে যত্ন করে বইটি নিজেই ছাড়ার উদ্যোগ নেন র‍্যাঁবো। ব্রাসেলস থেকে ছেপে বের করেন ১৮৭৩–এর অক্টোবরে। এরপর প্যারির বিভিন্ন কবি ও সমালোচকদের কাছে পাঠিয়ে দেন; পাঠান বিভিন্ন সাহিত্য পত্রিকায়। কিন্নতু তিনি ইতোপূর্বেই 'শয়তানের অনুচর' হিসাবে চিহ্নিত হয়ে আছেন প্যারির প্রতিষ্ঠিত কবিমহলে, তাঁরা স্বাভাবিকভাবেই বইটি প্রত্যাখ্যান করেন। সাহিত্যে প্রতিষ্ঠানের ভূমিকা সর্বত্র একই রকম, সে–সময়েও ছিল এ–এসময়ের মতোই। র‍্যাঁবোকে এই প্রত্যাখ্যান একটি বিরাট ধাক্কা দেয়। এবার তিনি পায়ে হেঁটে ফিরে যান

শার্লভিলের বাড়িতে। হতাশ র‍্যাঁবো তার সমস্ত সৃষ্টি ধ্বংসের উদ্যোগ নেন, সম্ভবত এসময় তার বই ও পাণ্ডুলিপি আগুনে পুড়িয়ে ফেলেন।

আলোকোজ্জ্বল দ্যুতি, নরকের মরসুম

১৮৭৫ সালে ভের্লেন জেল থেকে মুক্ত হলেন। ভের্লেন ও র‍্যাঁবো পর্বের ভাঙন যদিও দুবছর আগেই ঘটে গিয়েছিল। এই ভাঙনের চূড়ান্ত পরিণতিই ছিল ভের্লেনের কারাবাস। ইতোপূর্বে ১৮৭২ সালে র‍্যাঁবো নিজের বাড়ি থেকে প্যারি চলে আসেন, হোটেলে একটা ঘর ভাড়া করে দুজনে থাকতে শুরু করেছিলেন। র‍্যাঁবো এ সময়ের লেখা–ভাবনায় নিজেকে একজন আততায়ী হিসাবে উপস্থাপিত করেন। শুধু এই নয়, ইতোপুর্বে লেখা অ্যালকেমি আহুত জ্ঞানের দারুণ তিনি যে আনন্দানুভূতি, ঐশ্বর্যের গৌরবের ভাবনায় ভাসছিলেন তা থেকে সরে আসেন। নারকীয় যন্ত্রণা, তার অনুভূতি ও প্রকাশই মুখ্য হয়ে ওঠে। সাম্রাজ্যবাদী বিস্তারের সামনে ব্যক্তি অবস্থানের নিঃসঙ্গতা ও দ্বন্দ্বে তিনি দীর্ণ হচ্ছিলেন। অন্তর্দ্বন্দ্বের ফলে উদ্ভূত দ্রোহ তাঁর লেখায় আনে নতুন বিদ্রোহ, ভাঙাচোরা ও পরীক্ষা–নিরীক্ষায় মরিয়া হয়ে ওঠেন তিনি। 'নরকে এক ঋতু' তার জ্বলন্ত প্রমাণ। তবে শেষদিকের কবিতায় র‍্যাঁবো তাঁর শৈশবভাবনাকে অবলম্বন করেন, গড়ে তোলেন যাদুর নিজস্ব জগৎ, স্পষ্ট ও অস্পষ্টকে মিশিয়ে ফেলেন। এই ঘটনা সিম্বলিস্ট মুভমেণ্টের অনুঘটকের কাজ করেছিল। এক্ষেত্রে এলিড স্টার্চির বক্তব্য প্রণিধানযোগ্য, র‍্যাঁবোর অতিন্দ্রিয়তার সঙ্গে কুলিয়ে উঠতে পারছিল না গতানুগতিক শব্দবিন্যাস, যার দারুণ প্রতীক ছাড়া আত্মপ্রকাশের অন্য উপায় ছিল না তাঁর। পাঠকের কাছে শব্দের মানে পৌঁছয় না। পৌঁছায় আলোকোজ্জ্বল দ্যুতির ঝাপটা।

র‍্যাঁবো 'নরকে এক ঋতু' লেখা শুরু করেছিলেন ১৮৭৩ সালের এপ্রিলে, সে–বছরই ৮ জুলাই ব্রাসেলস থেকে ভের্লেনের টেলিগ্রাম আসে যে তিনি যুদ্ধে যাচ্ছেন, তার আগে র‍্যাঁবোর সঙ্গে দেখা করতে চান। র‍্যাঁবো ব্রাসেলসে হাজির হন, কিন্তু আবার দুজনে মিলে লন্ডনে থাকার ভের্লেনের প্রস্তাবে র‍্যাঁবো রাজি না হলে ভের্লেন খেপে যান। তিনি এরপর মদ্যপান করে আচমকাই র‍্যাঁবোকে লক্ষ করে গুলি ছোঁড়েন, একে একে তিনটি গুলি। একটা লাগে র‍্যাঁবোর হাতে। ভের্লেনের দুবছর কারাবাস হয় ও দুশো ফ্রাঁ জরিমানা। জেল থেকে ছাড়া পেয়ে ভের্লেন র‍্যাঁবোর সঙ্গে দেখা করতে যান। কিন্তু র‍্যাঁবো তখন কবিতা থেকে দূরে চলে যাচ্ছেন, ভের্লেনকে উদাসীনভাবে প্রত্যাখ্যান করেন। এরপরের বছর জার্মান ভাষা শেখার জন্য জার্মানির স্টুটগার্ড চলে যান র‍্যাঁবো। অনেকের অভিমত, এ–সময়েই Illumination–এর কবিতাগুলি লিখেছিলেন, তা ছাপারও উদ্যোগ নেন এ–সময়ে। একদিন আচমকাই আলপসের পথে হাঁটা দেন, পায়ে হেঁটে আল্পস অতিক্রম করে ইতালিতে ঢুকে পড়েন। সেখানে তিনি অনাহুত, ফিরে আসতে হয় ফ্রান্সেই। অস্থির হয়ে ওঠেন উন্মাদের মতো, ছুটে বেড়াতে থাকেন। হল্যান্ডের সেনা হয়ে ইন্দোনেশিয়া, সার্কাসের দোভাষী হয়ে ব্রোস ও হামবুর্গ, সুইডেন, ডেনমার্ক। আবার পায়ে হেঁটে সুইজারল্যান্ড, সেখানে আলেকজান্দ্রিয়া। সাইপ্রাসে ফোরম্যানের কাজ করেন। এরপর এক কফি ব্যবসায়ীর অধীনে কাজ করেন, হারারে যান নানা জিনিস আমদানির ব্যবসায়, সত্যিকারের দুষপ্রাপ্য বস্তুর ব্যবসা শুরু করেন। এরপর অস্ত্র ব্যবসাতেও জড়িয়ে পড়েন র‍্যাঁবো। ১৮৭৯ সালে ফের সাইপ্রাসে। এ–সময় কবিতা থেকে অনেক দূরের মানুষ তিনি। এ–সময়ে বন্ধু দলাইয়াকে কবিতা প্রসঙ্গে বলেছিলেন, 'এ–সব নিয়ে আর ভাবি না।'

২০ মে মার্সেই পৌঁছে হাসপাতালে ভর্তি হন র‍্যাঁবো। ইতিমধ্যে উচ্ছৃঙ্খল জীবনযাপনের ক্ষত বইতে শুরু করেছে শরীর। একটি পা পচনে নষ্ট হওয়ার পথে। ২৭ মে মায়ের উপস্থিতিতে ডাক্তারেরা তাঁর পা কেটে ফেলতে বাধ্য হন। কিন্তু আবারও অসুস্থ হন, সেবারেই। বোন ইসবেলাকে সঙ্গে নিয়ে হাসপাতালে ভর্তি হন। ক্যান্সার ছড়িয়ে গেল শরীরে। ১০ নভেম্বর সকাল ১০ টায় শেষ বিদায় নেন এই অপূর্ণজীবন শিশুটি।

লোকনাথ ভট্টাচার্যের ভাষায়, ''ওই যে কথায় কথায় বলেছিলেন, 'নরকে একে ঋতু'–তে চলে যাবেন অনেক দূরে মরুপ্রান্তে, সমগ্র দেহ তৃষ্ণায় পুড়ে ছাই হয়ে যাবে, ফিরবেন উত্তপ্ত লোহার মতো শরীর নিয়ে, সোনার সন্ধান নিয়ে, চোখ জ্বলবে রাতের অরণ্যের হিংস্র শ্বাপদের চোখের মতো–এ কথা তিনি অক্ষরে–অক্ষরে পালন করেছিলেন সমস্ত জীবন দিয়ে। তাঁর দুঃসহ স্পর্ধা ব্যর্থ গর্বের দ্বারা লাঞ্ছিত হয় নি।''

এখানে ছবি আছে।

দেখ পৃথিবী কি আশ্চর্য নীরব ঘুমোচ্ছে
আকাশের ভাণ্ডার উপচে উপহার এসেছে
অগুন্তি নক্ষত্র
ঠিক এসময় একজন দাঁড়িয়ে ওঠে, কথা বলে
সে তখন সময় ইতিহাস ও মহাবিশ্বের দিকে তাকিয়ে

১৪ এপ্রিল : এক ট্রাউজার পরা মেঘের মৃত্যু

৭৫ বছর আগে, ১৯৩০-এর ১৪ এপ্রিল আত্মঘাতী হন মায়াকোভস্কি। এর আট বছর পর তাঁর শেষের সেই দিনগুলোর স্মৃতিচারণা করেন কবির প্রেমিকা পেলেনস্কায়। এই স্মৃতিচারণের সূত্র ধরেই মায়াকোভস্কিকে জানার এই প্রয়াস।

'১৪ এপ্রিল ১৯১৩। সকাল আটটায় মায়াকোভস্কি এলেন, ট্যাক্সি করে। খুব অসুস্থ দেখাচ্ছিল তাঁকে। দিনটা ছিল বসন্তের রঙে রঙিন, ঝকঝকে ও উজ্জ্বল। বসন্ত দারুণ সুন্দর আমি বলেছিলাম সূর্যটাকে দ্যাখো। গত কালকের পাগলামোগুলো মাথা থেকে ঝেড়ে ফেলেছ নিশ্চয়ই। চলো ওইসব ঝগড়াঝাটি ভুলে যাই, ভুলে যাই কালকের ঘটনাও-কথা দাও। তিনি বললেন, সূর্য দেখি নি আজ। মনে পড়ছে, সত্যি মাঝে-মাঝে কেন যে এরকম হয়! আমার জন্য আর কাউকে ভাবতে হবে না, অনেক হয়েছে, চলো, বাড়ি গিয়ে কথা বলা যাবে।'

আমি যদিও এক মিনিট ও দেরি করতে পারছিলাম না তাঁর ওখানে, বললামও, সাড়ে দশটায় থিয়েটারের রিহার্সেল আছে। তবুও ট্যাক্সি নিয়ে আমরা চললাম। লুবিয়াক স্ট্রিটে পৌঁছে মায়াকোভস্কি ট্যাক্সিটাকে অপেক্ষা করতে বললেন। আমার রিহার্সেলে যাওয়ার তাড়া দেখে খুব বিমর্ষ ও বিপর্যস্ত মনে হচ্ছে তাঁকে। উত্তেজিত হয়ে উঠলেন-'ওঃ, আবার সেই থিয়েটার, ঘেন্না হয় আমার। চুলোয় যাক তোমার থিয়েটার। এভাবে আর চলা যায় না। না-তোমাকে আর রিহার্সেলে যেতে হবে না। এই ঘরে তুমি আমাদের সঙ্গে থাকবে, কোথাও যাবে না,। রীতিমতো উত্তেজিত তিনি। দরজায় তোলা দিলেন, চাবি রেখে উত্তেজনায় পায়চারি করতে লাগলেন। গায়ের কোট আর মাথার টুপি মেঝের ওপর। আমি হতাশ হয়ে সোফাটায় গিয়ে বসলাম, তিনি আমার পাশে এসে বসলেন মেঝের ওপর। আমি মাথা থেকে টুপিটা খুলে দিই, আস্তে আস্তে হাত বুলিয়ে দিই। আপ্রাণ চেষ্টা করি ওর রাগ ও উত্তেজনা কমাবার জন্য। এমন সময় দরজায় কেউ কড়া নাড়ে। বইয়ের দোকানের ছেলেটা মায়াকোভস্কির জন্য লেনিন রচনাবলি নিয়ে এসেছে। ঘরের পরিশেটা বুঝেই সে বই নামিয়েই চলে যায়।

মায়াকোভস্কি ততক্ষণে উঠে দাঁড়িয়েছেন, দ্রুত পায়চারি করতে থাকেন। বিড়বিড় করে ধমকের সুরে বলেন, 'আমাকে তাঁর সঙ্গেই থাকতে হবে, সেই মুহূর্ত থেকেই, এজন্য আমার স্বামী ইয়ানশিনকে কোনো জবাবদিহি করার দরকার নেই আমার, থিয়েটারও ছাড়তে হবে, রিহার্সেলে আর যেতে হবে না। তিনি করে আসবেন, ইয়ানশিনকেও যা বলার তিনিই বলবেন। আমাকে আর তাঁর সঙ্গে দেখা করতেও দেবেন না। এসব একনাগাড়ে বলতে থাকলেন, আমাকে ঘরে তালাবন্দি রেখে মায়াকোভস্কি বাইরে গিয়ে আমার যা যা দরকার কিনে আনবেন। আমার প্রতি উজাড় করা যত্নে ও আদরে থিয়েটার ভুলিয়ে দেবেন তিনি, আমার গোটা জীবন, সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার থেকে মোজার ভাঁজ পর্যন্ত তিনি খেয়াল রাখবেন। গতকালের ঘটনার জন্য বারংবার অনুশোচনা করছিলেন, বলছিলেন—'গতকাল আমরা ছিলাম নির্বোধ, বিবেচনাহীন আর নীচ।' গতকাল সন্ধ্যায় পরস্পরের প্রতি আমরা যে বিদ্রুপ লিখে গিয়েছিলাম এর মধ্যেই সেই পৃষ্ঠাগুলো নষ্ট করে ফেলেছেন তিনি।

আমি তাঁকে আবারও বলি, ওঁকে কতটা ভালোবাসি, ওর সঙ্গে থাকব। শুধু ইয়ানশিনকে একথা বলে আসব একবার। ইয়ানশিনও আমাকে ভালোবাসে, তাকে এভাবে ছেড়ে আসা

সে সহ্য করতে পারবে না; তাঁকে এভাবে আঘাত দিতে আমিও পারব না। স্বামীকে ভালোবাসি ও শ্রদ্ধা করি আমি। থিয়েটার ছাড়াটাও আমার পক্ষে অসম্ভব। থিয়েটার ছাড়লে তা এক বিরাট শূন্যতার জন্ম দেবে আমার জীবনে, এটা মায়াকোভস্কি নিশ্চয়ই বুঝবেন। এই শূন্যতা অন্তরায় হয়ে উঠবে আগামীতে। তা ছাড়া, মস্কো আর্ট থিয়েটারের মতো আকর্ষণীয় প্রতিষ্ঠানের মঞ্চ ছেড়ে শুধু এক কবির সঙ্গে উঠে এলাম সেখান থেকে, রিহার্সেলে যাব বলে। কথা দিলাম, ফিরে আসব সন্ধ্যায়।

মায়াকোভস্কি মেনে নিয়েছিলেন, তবুও চাইছিলেন একটা তাৎক্ষণিক ফয়সালার। আমিও পরিস্থিতি অনুভব করার জন্য আকুতি করছিলাম। তিনি শেষবারের মতো আবারও জিজ্ঞাসা করলেন, এবার ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলেন। দ্রুতপায়ে ঘরের মধ্যে এ প্রান্তে ও প্রান্তে ছুটছিলেন যেন, ছুটে গেলেন ডেস্কের দিকে। কাগজপত্র হাতড়ানোর শব্দ পেলাম। তাঁর শরীরের আড়ালে, কিছু দেখা যাচ্ছিল না। এরপর একটা ড্রয়ার খুললেন তিনি। দ্রাম করে তা বন্ধ ও করে দিলেন। আমি জানতে চাইলাম–কী? তা হলে তুমি আমার সঙ্গে দেখাও করতে চাইছ না আর? শান্ত ও ধীরে পায়ে আমার কছে এগিয়ে এলেন, চুমু খেলেন, তারপর খুব নরম করে বললেন—'না প্রিয়তমা আমার, তুমি যাও। আমার জন্য চিন্তা করতে হবে না তোমাকে।, এরপর হাসলেন—'আর্থটি দেব তোমাকে। ট্যাক্সি ভাড়া আছে তো?

'না।' তিনি আমাকে ২০ রুবল দিলেন। 'তা হলে রিং করছ আমাকে? 'হ্যা, বেরিয়ে অবশ্যই করব। আমি বেরিয়ে সদর দরজার দিকে এগিয়েছি কয়েক পা। একটা গুলির শব্দ। আতঙ্কে চিৎকার করে ছুটে গেলাম করিডোরের দিকে। কিন্তু ভেতরে ঢুকতে ভয় হল। তারপর যখন ভেতরে ঢুকলাম, যেন একযুগ হয়ে গেছে। সারা ঘরে বারুদের ধোঁয়া, কার্পেটের উপর পড়ে আছেন মায়াকোভস্কি। হাত দুটো ছড়ানো। বুকের পর ছোট একটা রক্তের দাগ।

১৯৩০ এর ১৪ এপ্রিল, আত্মঘাতী হন মায়াকোভস্কি। সেই ঘটনার নির্জন সাক্ষী ভেরোনিকা পেলেনস্কায়া, ঘটনার আট বছর পর তার স্মৃতি থেকে এই বর্ণনা উঠে এল। ভালোবাসার জন্য আকুল উন্মাদনায় গোটা জীবন তাড়িত হওয়া মায়াকোভস্কিকে জীবনের কাছে আনতে চেয়েছিলেন অভিনেত্রী পেলেনস্কায়া, কিন্তু ঝড়ের এই পাখির মৃত্যু হল ঝড়ের দমকা হাওয়ায়। ভ্লাদিমির মায়াকোভস্কি, ২০ শতাব্দীর প্রথম 'ট্রাউজার পরা মেঘ', অর্থাৎ কবি যিনি সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের সঙ্গী থেকে তাঁর সমস্ত শক্তি ও প্রতিভাকে ব্যবহার করতে চেয়েছিলেন। তার স্বপ্ন ও কবিতা মানুষের মিছিলে পায়ে পায়ে মিশে ছিল। কিন্তু স্বয়ং রিক্ত এই মানুষটি নিঃসঙ্গ মেঘের মতো ভেসে বেড়ান সারা জীবন, শরীরভর ভালোবাসার জলকণাকে বৃষ্টিবিন্দু হয়ে ঝরিয়ে দিয়েছিলেন তিনি। প্রেমেই ছিল তাঁর পৃথিবীর কেন্দ্রবিন্দু, একে ঘিরেই আবর্তিত হত তার সমাজ–স্বপ্নও। এই কেন্দ্রচ্যুতির যন্ত্রণায় তাই লিখতে হয় তাকে—`সমুদ্রেও ফিরে যায়/ সেও এখন ঘুমোতে চলল/ গল্পের শেষ এখানেই মানুষ তেমনই ভাবে/ আমাদের তুচ্ছ কাজে ডুবে গেছে প্রেমের শিকার/যাবতীয় হিসাবনিকাশ শেষে...' কে এই পেলেনস্কায়া? মায়াকোভস্কির থেকে বয়সে ১৪ বছরের ছোট, বাবা–মা দুজনেই রাশিয়ার প্রখ্যাত ফিল্ম অভিনেতা অভিনেত্রী ছিলেন। থিয়েটার নিয়ে মস্কো আর্ট থিয়েটার থেকেই স্নাতক হন পেলেনস্কায়া, বিয়ে করেন অভিনেতা প্রযোজক মিখাইল মিখাইনোভিচ ইয়ানশিনকে। পেলেনস্কায়া ছিলেন এক প্রাণোচ্ছল সুন্দরী অভিনেত্রী। মায়াকোভস্কির সঙ্গে আলাপ ১৩ মে ১৯৫৯; এক ঘোড়াদৌড় মাঠে। এই পরিচয়পর্বের প্রণয়ে উত্তরণ ঘটে মস্কো আর্ট থিয়েটারে–থিয়েটার সূত্রে, মায়াকোভস্কি আসতেন সেখানে। ১৪ এপ্রিল ১৯৩০ মাঝে মাত্র ১১ মাস, কবি যেন ছিলেন উথালপাথাল। পেলেনস্কায়া আপ্রাণ চেয়েছিলেন তাঁকে জীবনের দিকে ফেরাতে, কিন্তু জীবনের থেকে হাত গুটিয়ে নেন কবি। মায়াকোভস্কি এক ব্যতিক্রমী, ব্যাপ্ত কবি প্রতিভা। গোটা সোভিয়েত যুগের প্রতিভূ। যিনি অক্টোবর বিপ্লবকে 'আমার বিপ্লব' বলেন, 'লেনিন–এর মৃত্যুতে অনন্য এক আবেদনী কবিতা লেখেন। স্টালিন যার সম্পর্কে বলেন, 'তাঁর স্মৃতির প্রতি ঔদাসীন্য অপরাধ।' স্মৃতিচারণায় পাবলো নেরুদা যাকে বলেন 'শ্রেষ্ঠ সোভিয়েত'। `Public Poet with then dering voice and a countername like bronze, a magnnimous heart that revolutionised language and met head on the most different Problems in Political theory—'বহুদিনের স্থবির কাব্য ব্যবস্থার কাঠামোকে শ্রমিকের হাতুড়ির আঘাতে চরমার করে ভেঙে দিয়েছেলেন মায়াকোভস্কি। সম্মিলিত মানবাত্মার সঙ্গীতই তার কবিতা'

জন্মেছিলেন জর্জিয়ার এক গ্রামে, ১৮৯৪–এর ৭ জুলাই। ছোটবেলায় বাবার সঙ্গে ঘোড়ায় চড়ে পাহাড়ে–জঙ্গালে ঘুরে বেড়াতে বেড়াতেই মনের মধ্যে জন্মেছিল রোমান্টিক এক জগৎ। ছবি আঁকা দিয়ে শুরু সেই জগতে প্রথম পদচারণা। এর থেকে ক্রমে কবিতা প্রেম এবং মানুষের প্রতি প্রেম থেকে জন্ম নেয় বিপ্লবপ্রীতি। ১৯০৫–এর প্রথম রুশ বিপ্লবেই ময়দানে নেমে পড়েল, মার্কসীয় ভাবনায় আলোড়িত হন। বাবার মৃত্যুর পর মস্কো চলে আসেন, বলশেভিক পার্টির সঙ্গে যুক্ত হয়ে গ্রেপ্তার হন, মুক্তি পান, কবিতা লেখা শুরু। বুরল্যাক–এর সঙ্গী হয়ে ফিউচারজম–এর সঙ্গে যুক্ত হন।১৯১৩–তে প্রকাশিত হয়। ১৯১৫–তে গোর্কির সঙ্গে পরিচয়, প্রকাশিত হয় 'ট্রাউজার পরা মেঘ'

কবি হিসেবে তাঁকে এই লেখা স্বীকৃত এনে দেয়।১৯১৭–তে 'বিপ্লব' তাকে আমজনতার দরবারে প্রিয় করে ফেরে, বামপন্থী–শিল্পী–সাহিত্যিকদের সঙ্গে সংগঠন–এর কাজে যুক্ত হন। অক্টোবর বিপ্লব। লেনিনকে দেখে বিপ্লবের প্রত্যক্ষ সৈনিক হতে অনুপ্রাণিত হন। গোটা দেশ ঘুরে বেড়ান কবিতা ও বক্তৃতা করতে। কবিতার পাশাপাশি ছবি আঁকা, কার্টুন আকা, নাটক লেখা চলতে থাকে। তাঁর লেখা–Mystory Bouffe,(অক্টোবর বিপ্লবের বর্ষপূর্তিতে) মঞ্চস্থ হলে আলোড়ন পড়ে যায়। ১৯২৩– এর নাজিম হিকমত প্রমুখের সঙ্গে তার যোগাযোগ। পরের বছর লেনিনের মৃত্যুতে মানসিক আঘাত পান। 'ভ্লাদিমির ইলিচ লেনিন, কবিতাটি লেখেন। ১৯২৩–এ কিউবা ঘুরে এসে লেখেন Black & white। এরপর ক্রমশ এক অস্থিরতা তাকে ভেতর থেকে কুঁড়ে কুঁড়ে খেতে থাকে। এই অস্থিরতার প্রতিফলন তার ব্যক্তিগত জীবনচর্যায় এবং আচরণেও দেখা যায়। ১৯৩০, এর মারাত্মক পরিণতি তার আত্মহনন।

১৯২৪–এ পুশকিনের ১২৫তম জন্মবর্ষে মায়াকোভস্কি লিখেছিলেন-`So strongly hat/ every kind of dead thing/ so much I adore/ every kind of life। এর দু'বছর পরে লেখা Sergei Esenin– এর লাইনগুলো `Dying in this life/ is not so hard/ building life/ is harder/ I dare say. নাজিম হিকমতের মতে সোভিয়েত রাশিয়ার নতুন করে গড়ে ওঠা সমাজের স্পন্দনের সঙ্গে মায়াকোভস্কি জীবনস্পন্দন একাত্ম হয়ে গিয়েছিল। তাঁর কবিতাই হিকমতের নির্দেশক ছিল। মায়াকোভস্কি 'A could in Trousers' পাঠ করে গোর্কি আনন্দে কেদে ওঠেন। নতুন পৃথিবীর পথে মায়াকোভস্কি এক অনির্বাণ আলোকস্তম্ভ। লুনাচারস্কির কথায় 'Mayakovsky did allhe could to pave the way for the man of the future বিপ্লবের প্রতি ভালোবাসা, যুদ্ধের প্রতি ঘৃণা তার আঁকা ছবি ও কার্টুনের মতো কবিতাতেও তীব্রভাবে উচ্চারিত হয়েছে। ১৯১৪–১৬ দু'বছরের মধ্যে লেখেন—wars declared'-এর মধ্যে যুদ্ধের বিরুদ্ধে তীব্র বিষোদগার দেখতে পাই। এই কবিই আবার ভিন্ন আমেজে লেখেন ট্রাউজার পরা মেঘ' (A could in trousers) যাতে রয়েছে জীবনযন্ত্রণা স্ফুরণ–'আমার আত্মায় নেই একটিও বিবর্ণ লোম/ মায়ামমতার বেশ/ রয়েছে গলার বজ্রনির্ঘোষ/ আমার বাইশ বছর দৃপ্তপায়ে টে চলে...ওঃ কে কথা বলে?/ তুমিই হয়, মা আমার/ তোমার ছেলের ভয়ানক অসুখ/ প্রতীক্ষার সময় নেই আর বুকে আগুন জ্বলছে/ আমার প্রিয় বোনেরা ওদের বলো/ দেরী হয়ে যাবে হয়তো/ মা আমার, আমার আমার গলা দিয়ে সুর বের হয় না/ বারুদের ধোঁয়া এসে প্রাণের সমস্ত শব্দ পিষে ফেলছে। 'মারিয়া, কাছে এসো/ একটু কাছে এলো/ নির্লজ্জ নগ্নতায় কাঁপছে তোমার শরীর/ তোমার রক্তবর্ণ ঠোঁটে. দাও অম্লান প্রেম... মারিয়া. দাও, আমাকে দাও/ চলো চলে যাই, আর থামিও না/ আর ভুল করতে চাই না/ শান্তি হতে পারছি কই?/ তোমার মনে নেই নক্ষত্রের মুখ/ ওই আকাশ হত্যার রক্তে লাল/...পৃথিবী, এখন ঘুমোবে, বিশাল তার কান তারায় তারায় ভরা থাবার চিহ্ন।, তারার ভেতর থাবার চিহ্ন দেখেছিলেন মায়াকোভস্কি, যার ছিল ট্রাউজার পরা মেঘ, সেই কবি গোটা জীবন স্বয়ং প্রেমের এক ঘুর্ণিস্রোতের আখ্যান রচনা করেছেন। গুলিবিদ্ধ রক্তাক্ত নিথর তার শরীরের বুক পকেটে পাওয়া যায় যে কবিতাটির পাণ্ডুলিপি, তার শেষ ছত্র–

দেখ পৃথিবী কী আশ্চর্য নীরব গুমোচ্ছ
আকাশের ভাণ্ডার উপচে উপহার এসেছে
অগুন্তি নক্ষত্র
ঠিক এসময় একজন দাঁড়িয়ে ওঠে, কথা বলে

সে তখন সময় ইতহাস ও মহাবিশ্বের দিকে তাকিয়ে এই মর্মান্তিক দুর্ঘটনার ঠিক ৭৫ পরেও মনে হয় তার লেখা শেষ ছত্রের মতোই সময়, ইতিহাস ও মহাবিশ্বের দিকে তাকিয়ে রয়েছেন ট্রাউজার পরা মেঘের কবি মায়াকোভস্কি।

হাংরি ফাল্গুনী রায় : আত্মার খিস্তি ও চিৎকার

'মানুষের জন্মে তেমন রহস্য নেই আর সব রহস্য শুরু হয়/মানুষের মৃত্যুর দিনে'—এই মৃত্যুর দিনকে মুঠোয় ভরে রহস্যের দিগন্ত পেরিয়ে যান কবি। দিনটি ছিল গরমে হাঁসফাঁস ৩১ মে ১৯৮১। ১৯৪৫–১৯৮১ মাত্র ৩৬ বছর বয়সের অশান্ত অস্থির ফাল্গুনী রায়ের আরো এক রহস্য যাত্রার এ যেন সূচকবিন্দু। কেউ কেউ হয়তো ভেবে থাকবেন যে ফাল্গুনীর কবিতার পাশে আত্মার খিস্তি ও চিৎকার, এই বিন্দুর যতিচিহ্নের পর থেমে যাবে, কিন্তু তা হয় নি, তিন দশক পার হয়ে এসেও এই চিৎকার বাংলা কাব্যভাষার শরীরে তেমনি শোনা যায়। যেমন অনায়াসে এই কবি উচ্চারণ করেছিলেন—

একা একা ২৭ বছর বেক্তিগত বিছানায় শুয়ে দেখি
মেধাহীন ভবিষ্যত জরাগ্রস্ত স্নায়ুমণ্ডলীর পাশে কবিদের কবির কবিতা
চারিধারে ঢিবি দেওয়ালের নীরেট নিঃশক্ত অন্ধকার

জরাগ্রস্ত স্নায়মণ্ডলীর কথা নিছক কবিতার ভিতর গুঁজে দেন নি ফাল্গুনী, এর মেধাহীন ভবিষ্যতের ভাবনায় নিজেকেই ক্রমশ দুমড়ে–মুচড়ে ভেঙেছেন। ক্ষয়ের এই রক্তশূন্য প্রজন্মের আশঙ্কায় আতঙ্কিত তার সামনে 'চারধারে মাটির ঢিবি' আর তাতে বিম্বিত 'নিঃশক্ত অন্ধকার'। যন্ত্রণা আক্রান্ত কবি এভাবেই সমাজের অংশ হয়ে ওঠেন, এই সমাজঅনুভবি কবিকে তাই সময় মুছতে পারে না। আত্মবিনাশী উচ্চারণেও তাই তিনি থাকেন আত্মবিশ্বাসী—

তোমাদের পৃথিবীর পাশে আমার এই স্বমারণোৎসব
আমার স্বেচ্ছামৃত্যুর এই গান
আমায় দিয়েছে এনে নির্বাণের মহা সম্মান

তখন *হাংরির* ঝাঁকুনি থেমে গেছে। আশির শুরুতে আমরা ঐ ধাক্কা থিতিয়ে যাওয়ার পরও হাতে পেলাম বেশকিছু পত্রপত্রিকা, ইস্তাহার, কিছু বই যা হঠাৎ থাপ্পড়ের মতো চমকে দিল আমাদের। তিস্তাবাংলার এই প্রায় বিচ্ছিন্ন জনপদগুলোর আমরা, গুটিকয়েক সদ্য যুবক তখন হামাগুড়ি থেকে দাঁড়াতে চাইছি মাত্র। কোচবিহারের এক প্রত্যন্ত গ্রামের এক প্রাইমারি স্কুল শিক্ষক অরুণেশ ঘোষ, যার *শব ও সন্ন্যাসী* আমাদের টেনে গিয়েছিল ঐ হাওয়াগাড়ী গ্রামে। একদিন খররোদ্দুর মাথায় নিয়ে বিকাশ আর আমি হাজির অরুণেশের বাড়ি। এরপর মাঝেমাঝেই আমাদের এই যাতায়াত চলতে থাকে। একে একে শিলিগুড়ির রাজা সরকার, সমীরণ ঘোষ, মনোজ রাউত সবাই একে অন্যকে চিনে গেছি। হাতবদল হয়ে হাতে হাতে ঐসব *হাংরি* কাগজপত্র, বইপত্র। অরুণেশদাই তার সংগ্রহের থেকে সেই প্রথম দিন থেকেই, বেশ কয়েকটি বই পড়তে দেন, যার মধ্যে লোকনাথ ভট্টাচার্য অনূদিত র‍্যাঁবোর *নরকে এক ঋতুর* সঙ্গে ছিল *ক্ষুধার্তর* বেশ কয়েকটি সংকলন। *ক্ষুধার্তর* তৃতীয় সংকলনে (১৯৭৫) আমি প্রথম পড়ি ফাল্গুনীর কবিতা। সাইট্রোনিক কবিতা। শুরুতেই ধাক্কা—

হে আমার আত্মা অনন্ত নক্ষত্রের চাদোয়ার নিচে তুই শালা গান গাস
গাজা খাস চুপচাপ চাঁদের পাথর দেখতে দেখতে তোর মনে পড়ে
ঠিকঠাক চাঁদ দেখে পৃথিবীর লায়লা মজনুদের গান

অথবা

যে সময় রামকৃষ্ণ সারদামণিকে বোঝাচ্ছিলেন সংগমহীন দাম্পত্য
তারপরই জেগে ওঠে পুরুষাঙ্গ নেশার জন্য হারঘাম রক্ত
ঘিলু শুরু করে কান্নাকাটি/মনের বৃন্দাবনে পাড়াতুতো দিদি বোন
বৌদিদের সঙ্গে শুরু হয় পরকীয়া প্রেম

এভাবেই ফাল্গুনী সপাট লাথি দেয় আমাদের শৈশবলালিত ট্যাবুগুলোতে, যাবতীয় আদিকল্প ভেঙে গুঁড়িয়ে যায়। তখন আমরা ১৭–১৮–র সদ্য যুবক। কবিতাযাপনের সূচনাপর্ব, এসময় একটা অস্থিরতা থাকে, একটা না–খুস যন্ত্রণা থাকে, একটা কামোদ্দীপকউসখুস সবসময় ভর করে বুকের ভিতর হামি দেয়, সেই সময় হাতে এল *নষ্ট আত্মার টেলিভিশন*। একই সঙ্গে র‍্যাঁবো ও ফাল্গুনী। ওর ভাই তুষার, ব্যান্ডমাস্টার। একটা ভাঙন, একটা বন্যা–বিপর্যয় টের পেলাম। প্রতিষ্ঠান ও প্রাতিষ্ঠানিকতাকে কীভাবে

সার্বিক আক্রমণের বিষয় করে তুলতে হয় তার নমুনাগুলো এভাবেই আমাদের তাৎক্ষণিকভাবে বিপর্যস্ত করে দিল। ফাল্গুনীর 'ফ্রেস ইনফরমেশন'

ভাদ্রের রোদ আমায় কুকুরের কামোত্তেজনা জানানোর বদলে
জানালো শরৎ এসে গেছে।

অথবা

আত্মাঅনুসন্ধান চুলোয় গেল আমার ব্যর্থতা হো হো করে
সে উঠল তাবত সফলতার প্রয়াসের কাছে—কেবল মধ্যরাতের
অমোঘ যৌনতা জানাল সে আমায় ছেড়ে যায় নি এখনো।

এ যেন এক মহানাগরিক অভিজ্ঞতার চরম বিচ্ছিন্নতাবোধ, আত্মখন্ডন ও যান্ত্রিক আকরণবাদের জটিল বুননের ভেতর থেকে আর্ত এক চিৎকার। কবি হয়ে ওঠে গুপ্তঘাতক, স্থিতাবস্থাকে ভেঙে ফেলে স্থিতু উপরের স্তরকে সরাসরি চ্যালেঞ্জ জানানোর ইতিহাসের ফিরে আসা এভাবে, বারংবার। প্রতিআক্রমণ ও আত্মরক্ষার নিজস্ব কৃৎকৌশল শিখে নেওয়ার কুশলী খেলুড়ে হওয়ার বাসনামুক্ত ফাল্গুনী আবারও বেশ অগোছালো থাকেন তার স্বভাবের গুণেই। আমাদের এই অতর্কিত, অগোছালো আক্রমণ প্রাণিত করে, উজ্জীবিত করেছিল তখন। এসবই ঠেলে দিয়েছিল জলের দিকে, সাঁতার শেখায় যেভাবে পশুপাখি তাদের সন্তানদের।

কাশীপুরের তুষার ফাল্গুনীদের বাড়ির সামনের রাস্তাটার নাম তাদের দাদুর নামে, রতনবাবু রোড; যশোর জেলায় নড়াইলের জমিদার বংশের সন্তান বনবিহারী রায়ের ছেলেমেয়ের মধ্যে এই দুই অশান্ত সন্তান বেড়ে উঠেছিল অবজ্ঞা উপেক্ষা নিয়েই। এদেরই আরেক দাদা বিমল রায়, নাটক নিয়েই কাটিয়ে দেন গোটাজীবন। ঔপনিবেশিক শাসনের মধ্যসময় থেকেই ক্রমশ ভাঙতে শুরু করে সামন্ততান্ত্রিক বাংলার সমাজ–কাঠামো, জমিদারতন্ত্রের অন্তিম বিউগল বেজে গেছে দেশভাগের আগেই। নড়াইলের দোর্দণ্ডপ্রতাশ জমিদারেরা বস্তুত কপর্দকশূন্য। কাশীপুরের বিরাট অট্টালিকা রাজবাড়ীকে গ্রাস করতে থাকে দারিদ্যের বন্য অন্ধকার। বিশাল অট্টালিকার কোণে কোণে জমাটবাঁধা অন্ধকারে তাই হারিয়ে যায় জমিদারের সন্তান–সন্ততিরাও। একে অন্যের কাছেও অপরিচিত হয়ে ওঠে। ধীরে ধীরে যে যা পারে বিক্রি করে ক্ষুধা মেটানোর চেষ্টা করার পর এক সর্বস্বান্ত পরিণতির দিকে এগোয়। দারিদ্র্য ও ঐতিহ্যযন্ত্রণার টানাপোড়েনের পরিণতিতে এদের গ্রাস করে নানা উপসর্গ। নেশাগ্রস্ত আত্মহননের আয়োজনের পেছনে এই ঐতিহ্যযন্ত্রণা ও হতাশা বড় ভূমিকা নিয়েছিল, তুষার, ফাল্গুনীরা তাই এই মাদক বিছানো পথ দিয়েই অনেক আগে চলে জীবনের শেষবিন্দুতে। যদিও বাংলা কবিতার এই দুই ক্ষণজন্মা পুরুষের মধ্যে কোন মিল ছিল না, না কবিতায় না জীবনযাপনে। এদের মধ্যে সদ্ভাবও নষ্ট হয়ে গিয়েছিল শেষ দিকে। যদিও দুই অকালপ্রয়াত কবির আত্মহননের প্রক্রিয়াটা ছিল প্রায় একই রকম, এতে সাহিত্যের ক্ষতি হয়ে গেছে অপরিসীম। সত্তর পরবর্তীতে তুষার ফাল্গুনীদের জমিদার প্রসাদের পরিণতি কিছুটা বোঝা যাবে *আয়ন্তক* সম্পাদক দিলীপ রায়ের বয়ানে: '...সিংহদরজা শোভিত প্রাসাদোপম অট্টালিকা, সেই মূল তোরণদ্বার অতিক্রম করে প্রাসাদ চত্বরে প্রবেশ করা গেল। একতলার বিভিন্ন ঘরের খোপে খোপে ভাড়াটে। বিশাল আকৃতির থাম সম্বলিত দীর্ঘ বারান্দাযুক্ত সুবিশাল জমিদার বাড়ি, কিন্তু স্থানে স্থানে পলেস্তারা খসা, ভগ্নপ্রায়, কেমন যেন মলিন পরিচর্যাহীন। মানুষের কাকলি সেরকম শোনা যায় না। লোককে জিজ্ঞাসা করে ভয়ে ভয়ে প্রায় অন্ধকার সিঁড়ি দিয়ে দোতালায় উঠলাম। এই সামন্ততন্ত্রের বিপর্যস্ত কঙ্কালের কাঠামোর ভেতর থেকে ভাঙনের কবিতা সৃষ্টি তাই ছিল স্বাভাবিক।' ফাল্গুনীর কবিতাও তাই তুষারের মতোই উপড়ে ফেলার বৃত্তান্ত হয়ে ওঠে। ঔপনিবেশিক শাসনের কেন্দ্রীকরণ প্রবণতায় যে কোলকাতাকেন্দ্রিকতার বাড়বাড়ন্ত তার আপাত আলোর ঝলকানির নিচে আনত অন্ধকারের ভেতর যে সম্ভ্রান্ত উদ্ভট অসামঞ্জস্য তার সীমারেখা ষাটসত্তরের সীমায় আরো প্রসারিত হয়। ফাল্গুনীর দীর্ঘ গদ্য *কাঠের ফুল*এ নীরব যেন ফাল্গুনীর ছায়া। এই গদ্যে ফাল্গুনী নামের এক চরিত্র থাকলেও নীরবের বয়ানের ভিতরই ফাল্গুনীকে পাওয়া যায়। জমিদারি ঐতিহ্যের রোমন্থনের হাহাকার সেখানে যেন ঘুরেফিরে আসে 'ঘাট ঘরের বাঁদিকে রামকৃষ্ণ মহাশ্মশান ডানদিকে রতনবাবু ঘাট ও তৎসংলগ্ন স্থানীয় জমিদারের পারিবারিক শ্মশানভূমি–নীরব স্থানীয় জমিদারেরই বংশধর এবং মরলে রামকৃষ্ণ শ্মশানের বদলে ওদের পারিবারিক শ্মশানেই ওকে পোড়ানো হবে—এই দিক থেকে, মানে জন্মসূত্রে নীরব আমার বা বাচ্চুর বা বাবলীর থেকে হাজার গুণ অভিজাত কিন্তু নীরব ঘুণাক্ষরেও কাউকে বলে না এই রাস্তাটি আমার পূর্বপুরুষের নামে বা এই আমাদের পারিবারিক শ্মশানভূমি...'আবার এই 'কাঠের ফুলেরই' নীরব প্রসঙ্গে লেখা আসলে নীরব একটু অন্য ধরনের ছেলে—আমরা যখন দলবেঁধে সিনেমায় কী মেলার মাঠের দিকেততখনও নদীতীরে একলা চুপচাপ বসে থাকত ঘণ্টার পর ঘণ্টা—কতদিন আমরা রামেশ্বর ইস্কুলের উল্টোদিকের ভাঙা ঘাটটায় গাঁজা খেতে গিয়ে দেখেছি চাঁদনি রাতের হিমের ভিতর নীরব একা বসে আছে—আসলে ফাল্গুনী গদ্যের ভেতর ক্রমাগত তার আত্মবয়ানে পৌঁছে যেতে চান এভাবেই, সেখানে অতৃপ্ত অসুখি ফাল্গুনী নিজের মুখোমখি হন।

শুধুই রাধিকা নয়ত গণিকাও ঋতুমতী হয়।

তিন সন্তানের পিতাতপরিবার পরিকল্পনায় আদর্শ পুরুষ
কৈশোরে করে থাকে আত্মমৈথুনত করে না কি?

অথবা,

দুটি অসমান সরলরেখা আমার দুচোখের মণির কেন্দ্রবিন্দুতে
উৎপন্ন শস্যের মতো তাকিয়ে থাকবে সোজাসুজি তোমার
নীলব্লাউজের আড়ালে
লুকিয়ে থাকা বিশাল সমুদ্রে ঝোড়ো ঢেউয়ে
ভেসে ওঠা শঙ্খস্তনের দিকে।

এরকমই ফাল্গুনীর কবিতার অন্যতম বৈশিষ্ট্য টেক্সট এবং যৌনতার অন্তর্বয়ন। সম্প্রতি এক ঘরোয়া আড্ডায় কথাকার দেবেশ রায় বলেন যে, 'বাংলা সাহিত্যের বন্ধনমুক্তি ততদিন হবে না যতদিন দৈনন্দিনের খিস্তিখেউর, যৌনতার স্বাভাবিক উচ্চারণ সাহিত্যে উঠে আসবে।' ফাল্গুনী এই উচ্চারণ করেছেন কবিতায় পদে পদে। কখনো কখনো ভিক্টোরিয়ান মূল্যবোধের নিগড়ে বাঁধা বাঙালি মধ্যবিত্তের ছুৎমার্গতাকে সপাটে আঘাত করেও। শালীনতার সীমানা ছাড়ানোর অভিযোগ সত্ত্বেও এ বাংলা কবিতাকে সাবাল করার দিকে এসবই ঠেলে দিয়েছে।।

বেলুড় মন্দিরের প্রণামরতা এক বিদেশিনীর স্কার্ট ঢাকা পাইথন পাছা দেখে
জেগেছিল আমার সীমাহীন যৌনতা মা তোমার যৌনতা
আমৃত্যু বাবার চিতার সঙ্গে

অথবা,

পাতাউদির ব্যাটিংভরা জৌলুসের মতো
নিজের পরিচয় তার বিশ্বের পরিচয়
সে আমার প্রজননকেন্দ্র অর্থাৎ লিঙ্গ।
সাধু ভাষায় শিবলিঙ্গ অসাধু নয় যারা তাদের কাছে
শুধু লিঙ্গ আর ওস্তাদের কাছে শিবরুদ্র।
ব্যক্তিগত নিয়ম

মাকেও এভাবে কল্পনায় এনেছেন এখানে কেউ কেউ ইডিপাস গুঢ়ৈষার দেখা পেলেও আমার মনে হয় যৌথ পরিবারের ভাঙন ও স্নেহহীনতার থেকেও সৃষ্ট বিচ্ছিন্নতার প্রকোপ এটা। তুষারের কবিতাতেও মা ছিলেন এক স্নেহহীন নারী হয়ে। আসলে যৌনতা ছিল ওর একটা আশ্রয়স্থল। এখান থেকেই তার কখনো কখনো বিকৃত মুখব্যাদানও দেখা যায়, না হলে জীবনানন্দের পঙক্তিকে ব্যঙ্গ করবেন কেন?

আমি নারী মুখ দেখার ইচ্ছায় মাইলের পর মাইল হেঁটে দেখি
শুধু মাগীদের ভিড়।

ভাষার যৌনতার মুক্তির প্রসঙ্গে অবশ্যই *হাংরি*দের বিরাট ভূমিকা রয়ে হেগছে। অনেকে মনে করেন যে *হাংরি*দের পক্ষ থেকেই প্রথম বাংলা সাহিত্যের প্রতিষ্ঠিত এঁদো চিন্তাভাবনা আর তার ভেক্টর প্রতিষ্ঠানের মুখে জোর থাপ্পর মেরে তার গিল্টি করা দাঁত উপড়ে তার ভেতরতার মালকরি ফাঁস করে দিতে চেয়ে লেখালেখির জগতে এসেছিলেন। মলয় রায়চৌধুরী, শক্তি চট্টোপাধ্যায় থেকে ফাল্গুনী রায় প্রত্যেকেরই বেড়ে-ওঠা অস্বাচ্ছন্দ্য, জ্বালা, ক্ষোভ আর বিদ্রোহকে বুকে নিয়ে। এদের প্রত্যেকের মধ্যে বাংলা সাহিত্যের, বিশেষত কবিতায় চলে আসা ন্যাকাচিত্ত পিলপিলে গীতিধর্মিতার প্রতি প্রচণ্ড বিরক্তি ক্ষোভ আর প্রত্যাখ্যানসহ নতুন একটা কিছু করার ছটফটানি কাজ করছিল। মলয় রায়চৌধুরী ১৩৭১-এর *মহেঞ্জোদারো* কবিতা পত্রিকায় 'গোখরোর আন্দোলিত উহুর' নিবন্ধে লেখেন—'কবিতা হল আগুনের ভেতর থেকে ঝলসানো বাহুর সিগনালিং। কবিতার বিষয়বস্তু এখন আমি, সিসমোগ্রাফিক আমি ভূমিকম্প, আমি ভাঙাচোরা ক্ষেতখামার।' ১৯৬১-তে আর্ট কাগজে ছাপা হয়ে প্রথম বেরোয় হাংরি মেনিফেস্টো। যার শুরুটা ছিল এমন—poetry is no more a civilizing manoeuvre, a replanting of the bamboozled garden, it is a holocaust, a violent and sommambulistic jazzing of the hyming fire a sowing of the tempertual hunger...' । পরে এর বাংলা বোরোয়। এর শেষ অংশ '...টেবলল্যাম্প ও সিগারেট জ্বালিয়ে, সেরিব্রাল কর্টেরসে কলম ডুবিয়ে, কবিতা বলবার কাল শেষ হয়ে গেছে। এখন কবিতা রচিত হয় অরগ্যাজমের মত স্বতঃস্ফূর্তিতে। সেহেতু ত্রশ্ন বলাৎকারের পরমুহূর্তে কিংবা বিষ খেয়ে অথবা জলে ডুবে, সচেতনভাবে বিহ্বল হলেই এখন কবিতা সম্ভব। শিল্পের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা কবিতা সৃষ্টির প্রথম শর্ত। ফাল্গুনী এই শর্ত থেকেই যুদ্ধযাত্রায় নেমেছিলেন। পাথরের মতো ফ্যাকাশে শীতল ও প্রাণহীন বাস্তবতাকে আক্রমণ করেছিলেন এরা, প্রতিষ্ঠানও এদের মেপে নিয়েছিল। তাই এক নৈঃশব্দ বরাদ্দ এদের জন্য ঐ পক্ষ থেকে। স্বতঃস্ফূর্ত নৈরাশ্যসাধক বলেই হয়তো মেইনস্ট্রিমের পোশাকি ড্রইংরুম আলো করতে পারে নি ফাল্গুনীরা। এটা নিছকই এক বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়, নকশাল আন্দোলন ও হাংরি তুলনায় দেবেশ রায় সত্তরের দশকে লেখেন— সামাজিকভাবে এই দুটি আন্দোলনেরই ভিত্তিভূমি নিম্নবিত্ত সমাজের হতাশা, ক্লান্তি আর অধৈর্য দর্শনের দিক থেকে এই দুটি আন্দোলনেরই প্রতিজ্ঞাভূমি তাৎক্ষণিক অভিজ্ঞতা। আর কর্মপ্রণালীর দিক থেকে এই দুটো আন্দোলনেরই পদ্ধতি স্বতঃপ্রণোদনার

ওপর নির্ভর করে প্রচলিত ব্যবস্থায় বিশৃঙ্খলা এনে দেওয়া। (ক্ষুধার্ত ২য় সংকলন) এই তীব্র বিবমিষা, সামাজিক ব্যবস্থাকে ভেঙেচুরে ফেরার প্রচণ্ড বাসনা উভয় ক্ষেত্রেই প্রকট থাকলেও গোড়াতেই গলদ, হাংরিদের কাছে শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত পারিপার্শ্বিকতা নয় কেন্দ্রবিন্দু নিজস্ব অস্তিত্ব থেকে উচ্চারিত, অহংসর্বস্ব হয়ে যায় তাই। ফাল্গুনী রায়ও তাই ফিরে ফিরে আসেন নিজের মুখোমুখি, নিজের চিত্রেই আঁকেন বিদ্রোহের ছবি —

লিখতে গেলে টের পাই পরিশ্রম–হাড়ের ভেতর থেকে
একটা টেলিফোন খুব চেনা মেয়েলি গলায় বলে ওঠে
'আমি তোমারি আমি তোমারি।
কৃষ্ণ যেমন নিজের ভেতর পেয়ে যেতেন শ্রীরাধা
তেমনি আমি মেয়েটির বালিকাবেলার ফ্রক পরা
দুপুরের শরীর হয়ে যাই তার যোনিতে জিভ রেখে দেখি
তার কুমারিত্ব কিশোরিত্ব ছেড়ে তারুণ্যের দিকে
ঢলে গেছে কখন কে জানেত
(আমি আমার মতন)

অথবা

আমরা যারা কলমকেই বাইবেল ও রাইফেল হিসাবে ব্যবহার করি
এবং মৃত সন্তানের শোক ভুলে যাই কামোত্তেজনায়
স্বার্থপরদের কুম্ভিরাশ্রুতে ভিজে যাওয়া বিপ্লবীদের বারুদ আমরা যারা
শুকিয়ে দিতে চাই
এবং কাউকে মারবেন না গাল দেবেন না এই শিক্ষা গ্রহণ করি
মাও সে তুংয়ের বই পড়ে আমরা যারা এবার ফিরাও মোরে পড়ে
কম্যুনিস্ট হয়ে যাই পরোপকার বৃত্তি থেকে স্বেচ্ছায় বিপ্লবী।
(কবিতা হটাও)

ছকে বাঁধা বাস্তবতার যে নির্মাণ তার বিপ্রতীপে 'চিহ্ন'ই প্রকৃত বাস্তব অবস্থা। ফাল্গুনী এই 'চিহ্ন'র দ্বারা তৈরি ছদ্ম বাস্তবতাকে আক্রমণ করেছেন স্বেচ্ছাচারী শব্দের আয়ুধ দিয়ে, বারংবার। 'চিহ্ন'র বিনির্মাণের সঙ্গে সঙ্গে আত্মবিনির্মাণও ঘটান। নিরন্তর টেক্সট হয়ে ওঠার প্রতিবেদনকে তিনি বলতেন 'অনৈতিহাসিক আত্মলিপি'। তাই সচেতন থাকছেন তিনি। 'সভ্যতার যুক্তিশৃঙ্খলায় নিহিত অন্ধবিন্দুগুলিকে আবিষ্কার করেই দায় ফুরিয়ে যায় না তাঁর, তিনি ওইসব অন্ধতাকে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে আরো দগদগে করে তোলেন।' (ড. তপোধীর ভট্টাচার্য)

স্টিফেন মালার্মে বলেছিলেন যে, অস্থির আধুনিক সমাজের পরিস্থিতি কবিকে স্বচ্ছন্দে বাঁচতে দেয় না। ফলে কখনো কখনো কবিকে দাঁড়িয়ে পড়তে হয় চলমান মানবস্রোতের উল্টোদিকে। কিন্নন্তু এই সত্যের বিপরীতেও একটা সত্য দাঁড়িয়ে পড়ে, পীড়ন যেখানে প্রবল, প্রত্যাঘাতের আকাঙ্ক্ষাও সেখানে তীব্র, এই পীড়ন ও প্রত্যাঘাত লেনদেনে অভ্যস্ত বাক চূর্ণ হয়ে যায়। বিনির্মিত হয় বাস্তবের আদলে, যেমন হয়েছেন ফাল্গুনী। কোনোধরনের বিশ্বাস মতাদর্শের, চিন্তার গণ্ডিরেখায় এরা স্বস্তিবোধ করেন না। এর ফলে সে হয়ে ওঠে প্রবল অন্তর্ঘাতময়, বাস্তবতাকে নামিয়ে আনেন অপরিণত, অসংগঠিত প্রান্তিক স্তরে। এই কারণে অনেকেই এই আঁভাগার্দ লিখিয়েদের 'অল্পবয়সী চটুলতা' বলে হাল্কাচালে গুরুত্বহীন করতে চান, ঘটিয়ে ফেলেন তাঁর অবমূল্যায়ন। ফাল্গুনীর কবিতা সংকলনের প্রসঙ্গে বুদ্ধদেব বসু লিখেছেন—

'যে বয়সে মানুষ স্বপ্নচালিতের মতো কবিতা লেখে, কথাগুলি একটার পিঠে আর একটা অপ্রতিরোধ্য বেগে এসে পড়ে, কলম একবার চলতে আরম্ভ করলে আর থামতে চায় না, এই কবি সে বয়স কখনো পার হন নি।...

এই কবিতাগুলিতে একটা আনকোরা উদ্যম ছন্দের ঝংকারে, অলংকারে ও অনুপ্রাসে আপনাকে প্রকাশ করেছে। প্রকাশের ভঙ্গিতে উগ্রতা কিছু বেশি। সম্পদ আছে পরিচ্ছন্নতা নেই, শক্তি আছে, সংযম নেই। রচনাগুলি উচ্ছৃঙ্খল, প্রগলভ, অনর্থক অনুপ্রাসে আবিল, অত্যধিক পুনরুক্তিতে ক্লান্তিকর। যদিও বুদ্ধদেব বসু শেষ পর্যন্ত এই আলোচনাতেই নতি থেকে কিছুটা সরে এসেছেন এই কবিতাগুলি অগোছালো, এলোমেলো, অত্যন্ত ঝংকৃত ভাষার উচ্ছলতা যে প্রাণশক্তিকে প্রকাশ করেছে, সেই প্রাণশক্তিকে শ্রদ্ধা করবো না, এত বড়ো বিজ্ঞ এখনও আমি হই নি।...উচ্ছ্বাসের ফেনিলতা সত্ত্বেও, ভাবাবেগ ধরা পড়ে সেটুকু খাঁটি; কবির অন্তরে সত্যিকার অনুভূতি ছিলো, বলবার একটা কথা ছিলো, এবং কবিত্বের এটাই মূলধন।' (কালের পুতুল)

ফাল্গুনী কেবল তারুণ্যের আতিশয্যে ভাঙনের কবি নন, তার বাচনকে চৌচির করে দেওয়াই নয়, এর মধ্য থেকে প্রতিবচনকেও তিনি অনবরত শাণিত করে তুলেছেন। এ কেবলমাত্র নৈরাজ্যের সন্দর্ভ নয়। ধ্বংশই তার শেষ কথা নয়, বুর্জোয়া মূল্যবোধ সম্পৃক্ত অন্তঃসারহীন মানব পরিস্থিতিকে পেরিয়ে যাওয়ার আকাঙ্ক্ষায় বাস্তবতার সীমারেখাও রূপান্তরিত হয়ে যায়। তাই ফাল্গুনী মানে সৃষ্টিছাড়া নষ্টামি নয়, ওর তাড়না ভেতরের প্রবল আর্তি। 'ধারালো ছুরির ওপর দিয়ে জীবনের হাঁটা' দেখেছেন কবি। তাই

লিখেছিলেন—'আমার মাথার ওপর কবি ও বিজ্ঞানী নভোমণ্ডল/আমার শির ও শরীরের পাশে ট্রাফিকের তিন আলো/ আমি মাতাল ও কবিদের সাথে গণিকা পল্লীর ভেতর,/ দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে ভেবেছি সাবিত্রী সত্যবানের কথা।' (কালোদিব্যতা)

পারিপার্শ্বিকতাকে অবজ্ঞা করে, প্রতাপময় 'চিহ্ন'–সমূহকে উৎপাটনেই সৃষ্টির আনন্দ তার। এক অর্থে তাই তাকে নৈরাশ্যপন্থী মনে হয়, তাঁর কবিতাও তাই আত্মকথনের অতিশয়োক্তি; অনেক কবিতায় কোনো শুরু বা পরিণতিও থাকে না, থাকে শুধু কবিতাহীন বয়ন। যেমন : 'পেটের বদলে দুটো কবিতা পকেটে নিয়ে গল্প কবিতার দিকে হাঁটি এই পথে একজন.অগ্নিযুগের বিপ্লবীর নামে রাস্তা ও বাজার আছে। আছে সত্তর দশকের একজন শহীদের জন্যে একটি শহীদবেদী এই পক্ষে।' অথবা

পুড়িয়ে ফেলো বুর্জোয়া ইতিহাস ধর্ষণ করো ক্লাসিক সাহিত্য
হ্যাঁ জাঁ লুক গদারের কথা একটু পাল্টে আমিও বলি
ক্লাসিক সাহিত্য বলে কিছু নেই
আছে শুধু বুর্জোয়া সাহিত্য ও বিপ্লবী সাহিত্য।

ফাল্গুনীর মাত্র একটি বই বেরিয়েছিল বই–এর আকার নিয়ে। এই দৃশ্য পৃথিবীকে দেখেন তিনি যেভাবে নামটাও রেখেছিলেন তেমনি *নষ্ট আত্মার টেলিভিশন*। নাম কবিতাটি বেশ দীর্ঘ। উল্লেখযোগ্য পঙ্‌ক্তি প্রচুর এখানে—আমি শ্রীচৈতন্যের প্রেমধর্ম অনুযায়ী একযোগে নকশাল ও মিলিটারির প্রতি আমার/ভালোবাসা বিলোবার ফলে আমি দুপক্ষের শত্রু হয়ে গেলাম আমি/দেখেছি আমার খিদে পেয়েছে আমায় ৫টি রুটি দাও বা আমায় চাক্রির/দরকার আমায় একটা চাক্রি দাও বললে কেউ একটা রুটি কিম্বা/চাক্রি পায় না তার কাছে পিকাসো সার্ত্র সত্যজিতের থেকে তখন একটা রুটি চাক্রির কামনা বেশি...'

অথবা

হিংসা ভালো লাগে না আমার বিপ্লব ভালো লাগে জোতদার ও কৃষকের।
যুদ্ধময় ধানক্ষেতে আমিও খেয়েছি খুব ধানশিষের দুধ–ধানসেদ্ধ
মদের দোকানে
ধানসিঁড়ি নদীর কিনারে কবির জন্মদিন পালন করে খুঁজেছি জীবনের আনন্দ

কখনও এখানে ভয়ানক আক্রমণাত্মক—

তবু শালা আমি বাঙালি মাক্সমূলার পড়ে জানব শতপথ ব্রাহ্মণের
ভগবান তাই সোম ও সুরা মানে সিদ্ধি ও মদ পান করব
একযোগে প্রায়শ সন্ধ্যায় আর বুদ্ধদেব বসু হার্থরিদের নিরক্ষর বলে
বিটবংশের ওপর লিখবেন ধীমান প্রবন্ধ হায় আমার চিন্তার ভাষা

ড. তপোধীর ভট্টাচার্য তাই যথার্থই লিখেছেন—সাহিত্যিকতার যে মাপজোখ ও আকরণ থাকে, তা এই জন্য ব্যবহার করা যাবে না, ফাল্গুনী 'সাহিত্য ও সাহিত্যকতা'–কে বেপরোয়া আক্রমণ করে গেছেন। অনেকটা সন্ত্রাসবাদী তৎপরতায়। তাঁর শব্দবন্ধ যেন আরডিএক্স–এর মতো বিস্ফোরক। সবকিছু তছনছ করে দিতে চেয়েছেন ফাল্গুনী, নিজের জীবনকেও। সবদিক খোলামুক্ত পাঠকৃতি তাঁর প্রতিবেদনশূন্য বয়ান, নির্মিতিশূন্য জীবন।' (উত্তরলেখ)

এই বিস্ফোরকটিকে তাই ব্রাত্য, অন্ত্যেবাসী করে ফেলার প্রক্রিয়া চালু রাখে নগর সাহিত্যের চালক ও ধূর্ত বেনিয়া কলমবাজরা। ফাল্গুনীর দ্রোহ তাই এ সময় 'ধূসর অতীতের ডায়নোসরের কঙ্কালের মতো বিহ্বলতা এনে দেয় মাত্র।'

মানুষীর উরুসন্ধিমূলে থেকে
জন্মজাত উষ্ণ প্রস্রবণ–প্রস্রবণের উৎসমুখে
কিছু নীরবতা আছে সফল সঙ্গমশেষে
পুরুষ ও নারী যেরকম সুখ–নির্জনতায় থাকে
অথবা ঈশ্বর যেমন নীরব একাকী তেমনি এক
আশ্চর্য নীরবতা কাজ করে আমাদের সৃষ্টির মূলে।

এভাবেই বাচন সন্ত্রাসের মধ্য দিয়ে এগোন তিনি, যেখানে যৌনতা থাকলেও তাকে বিনির্মাণ করেন অনায়াসে। ফাল্গুনী কবিতা লেখা শুরু করেন ষাটের দশকের মাঝামাঝি থেকে, দশ বছর তাঁর কবিতাযাপন। ক্রমশ তাড়াতাড়ি সে কবিতার মধ্য দিয়েই হাঁটতে হাঁটতে পৌঁছে যান আত্মবিনাশের দিকে। মাত্র পঁয়ত্রিশ বছর আয়ুষকাল, ১৯৪৭–এর ৭ই জুন জন্মেছিলেন এবং স্বেচ্ছা আহুত মৃত্যুর দিন ৩১শে মে ১৯৮১। এর মধ্যে কবিতাযাপন মাত্র ১৩ বছর। এই স্বল্প সময়ের অভিঘাত কতটা স্থায়ী হতে পারে তা সমসময় মাপতে পারবে বা পেরেছে বলা যায় কি? যে কথা দিয়ে এই আলোচনা শুরু সেখানে র‍্যাঁবো প্রসঙ্গ এসেছে। আশ্চর্য একটা মিল যেন দুজনায় ১৮৫৪ থেকে ১৮৯১ মাত্র ৩৬ বছর আয়ুষকালে র‍্যাঁবোও ওই বয়সেই কবিতা যাপন, অভিঘাতেও কাছাকাছি আনা যায় না কি?

যে *হার্থরির* অন্তিম শিবির ছিলো কোচবিহারে তার ক্যাপ্টেন ছিলেন অরুণেশ ঘোষ সত্তরের শেষ থেকে আশির শুরুতে কোচবিহারের *হাওয়রা গাড়ি*, ঘুঘুমারি থেকে বেরুচ্ছে অরুণেশ ঘোষের সম্পাদিত *জিরাফ*, জীবতোষ দাসের *রোবট*, শিলিগুড়ির রাজা সরকাররা বের করেছেন *কনসেনট্রেশন ক্যাম্প*, মনোজ রাউতের *ধৃতরাষ্ট্র*, *মাথাভাঙা*, *টার্মিনাস* প্রভৃতি। *হার্থরি* প্রবণতামগ্ন এসব প্রকাশ। ফাল্গুনীর শেষদিকের আপনজন এরাও। তার

শেষদিকের কবিতা 'কবিতা দেখা' যা যথেষ্ট নিন্দিত হয়েছিল 'বিদ্বজ্জন' দ্বারা সেখানে লেখেন তিনি—'প্রকৃত সংস্কৃতিকে যথার্থই ধবংশ করে/আর উল্লুকের বাচ্চাদের মতো হাংরিদের মাতাল অশ্লীল গেঁজেল/ড্রাগখোর/তখন সত্যি বলছি জীবতোষ/এইসব গ্রাজুয়েট গাণ্ডুদের যৌনাঙ্গে না নিজের লিঙ্গ নয়/শুধু খোসাসুদ্ধ গরম ডিম ঢুকিয়ে দিতে ইচ্ছে হয় আমার/Dear Jibotosh Das, Poetry had left me as my father left me forever in the year 1965, I too my birth in same Jaishtha ১৯৪৫ প্রিয় অরুণেশ সরি জীবতোষ/মৃত্যুর হলুদ রঙের চোখ, চোখ রাখছে আমার ওপর/আমি কি নই আমি কি সন্ন্যাসী গেঁজেল/আমি কি কবি আমি কি—'সম্ভবত এটাই ছিলো তাঁর অন্তিম উচ্চারণ। দেড় দশকের কবিজীবনে সবসময় প্রতিটি বস্নতুকে চিহ্নায়ক বলে মনে করে তাকে তীক্ষ্ণ বল্লমের মতো ব্যবহার করে গেছেন তিনি। ফাল্গুনী অনবরত পাঠকৃতি ও প্রসঙ্গের চিরাচরিত সম্পর্ক পাল্টে দিতে চেয়েছেন। সুতরাং সংযোগের পুরনো ধারণা দিয়ে তাঁর প্রতিবেদনকে বোঝা যায় না। ইচ্ছেমত তিনি প্রসঙ্গ থেকে প্রসঙ্গান্তরে গিয়েছেন। পূর্বে উল্লিখিত হয়েছে যে তিনি তার বয়ান জুড়ে তৈরি করে নিতে পারতেন প্রবেশবিন্দু ও নির্গমন বিন্দু।

ফাল্গুনী কবিতায় তাই অনায়াসে এনেছেন ক্রিকেট থেকে ময়দান, দাঁদ চুলকানি থেকে লেনিন, বুদ্ধ, রামকৃষ্ণ বা মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়। ক্রিকেট তো তাঁর অবসেশন—

জীবনের প্রথম ইনিংস শূন্য রান করার পর
দ্বিতীয় ইনিংসে সেঞ্চুরি করবার জন্যে আমি এখন তৈরি হয়ে নিচ্ছি
(ইট ইজ ক্রিকেট)

অথবা

পাতাউদির ব্যাটিংভরা জৌলুসের মতো
নিজের পরিচয় তার বিশ্বের পরিচয়
সে আমার প্রজননকেন্দ্র অর্থাৎ লিঙ্গ।
(অণ্ডকোষে ঝলোমলো দিন)

আসলে মনে হয় ভাষার ভেতরের ভাষা আবিষ্কারের নেশাও তাকে উন্মাদ করে তুলেছিল। তিনি ইউলিয়াম বারোজের মতো প্রতিবাচন তৈরি করার চেষ্টায় ভাষা ও সন্দর্ভের ধারণাকে নস্যাৎ করে এক নিজস্ব বয়ান পদ্ধতিও তৈরি করে নিতে চান। 'নাইলে ঠিক একুশ বছরের নৈঃশব্দপরিধি পেরিয়ে ফাল্গুনী রায়ের প্রতি সন্দর্ভ পুনঃপাঠ ও পুনর্বিবেচনার জন্য তৈরি হতো না। লেখকসত্তা যেহেতু আধিপত্যবাদ পরম্পরার ফসল, ফাল্গুনী বাচন–বাচক–সম্বোধককে আঘাত করে প্রতাপকে প্রতিহত করতে চেয়েছেন।' ফাল্গুনী ভাষার স্থাপত্যকে ধবংশ করে যাবতীয় সংস্কার ও প্রথানুগত্যের অভ্যাসকে সিংহাসনচ্যুত করতে চেয়েছেন। বারোজের মতো তিনিও যুদ্ধ ঘোষণা করেছিলেন এভাবে, সুন্দর–অসুন্দরের ভালোমন্দ নীতি নীতিশূন্যতার সব দেয়াল ধসিয়ে দিতে।

ঈশ্বরকে হাতের কাছে পেলে তার জ্যান্ত লাশ
মাটিতে পুঁতে শয়তানকে দিয়ে খাওয়াতুম
মদ মেয়ে কবিতার ভেতর কে বেশি রমরমে
বুঝতে পারছি না এখন—আমার কলম 'দাদ' লিখতে
গিয়ে 'হে নারী হে রূপসী' লিখছে ত'হে নারী হে প্রিয়া'
লিখতে গিয়ে 'দাদ–চুলকানি'–র কথা লিখে ফেলছে।

এভাবেই বাস্তবের ভেতরে যত অন্তর্বয়ান থাকে, তাদেরও ফালাফালা করে দেখাতে চান ফাল্গুনী। কোনো পরিমিতিতে তাঁর তীব্র অনীহা।

'ইচ্ছে আছে/লিঙ্গের উত্থান থেকে টেলিপ্যাথিক কম্যুনিকেশন/সম্পর্কে গূঢ় তথ্য জেনে নেবার/অথচ কিছুই করা হবে না আমার' (শেষ বিবৃতি)

তাঁর আত্মবয়ান 'সত্যিই এক সৌন্দর্যরাক্ষস/ভেঙে দিয়েছি প্রজাপতির গন্ধসন্ধানী শুঁড়।'

ফাল্গুনীর অকালমৃত্যুর পর দুদশক অতিক্রান্ত। আজও তাঁর কবিতা ও কবিতাযাপনের সামনে দাঁড়িয়ে কিছু জিজ্ঞাসার মুখোমুখি হতে হয়। বিগত সময়কালে সামাজিক ও সাংস্কৃতিক আধিপত্যবাদী বর্গ তাদের রণকৌশল বদলে নিয়েছে বলে সবই এখন সাহিত্যিকদের থেকে চ্যুতি ঘটেছে গোটা সমাজ কাঠামোটারই। স্বপ্ন, গ্লানি, ক্ষোভ, জয়–পরাজয়, কান্না, প্রেম সবকিছুই পুতুল সমাজের বড়বাজারের পণ্য হয়ে গেছে। সাজানো সম্পর্কের ভেতর ব্যাপ্ত সম্পর্কহীনতা যার আশঙ্কা থেকেই দ্রোহ ফাল্গুনীর। তাই আজ মনে হয় ফাল্গুনীর এই দ্রোহ ব্যক্তিমানুষের নয়, একক অহংয়ের নয়, সামাজিক ও সামগ্রিক। 'না বাপু আমি ঈশ্বর কিংবা শুয়ারের সন্তান নই/স্রেফ মানুষের বাচ্চা আপনিতুমিসেতাহারা রয়ে গেছে আমার ভেতর।' জ্ঞানীগুণী রূপবান মানুষ–মানুষের মিছিলে মুর্খকুৎসিত দরিদ্র মানুষ মানুষীর মিছিলে' ফাল্গুনী 'কলমকেই বাইবেল ও রাইফেল হিসেবে ব্যবহার' করেছেন। বারংবার তার স্নেহ/প্রেমহীন যাপনকথা থেকে আর্তি শোনা গেছে।

আমাদের ভালোবাসা ফিরিয়ে দাও
আমাদের ভালোবাসা ফিরিয়ে দাও

বারংবার যে মৃত্যুর উচ্চারণ তাঁর কবিতায় এসেছে, তাই তাঁকে অকালে টেনে নিয়ে গেছে।

‘জীবনকে বেসেছিলুম ভালো/দারিদ্র্য ও নৈরাশ্যের ভেতর/অসফল যৌনতাড়নার তীরে/সেই আত্মপ্রেমী ভালোবাসা/ছিল শুধু আলো হয়ে/মৃত্যুর উপত্যকার তীরে।’
তবুও শেষপর্যন্ত তাঁর বিশ্বাস ছিলো রাইফেল ও কবিতা দুজনেরই ম্যাগাজিন দরকার। ‘ক্রোধ হিংসার অনুভব ছুঁয়ে বুঝি জীবনের স্রোতের/অন্তঃস্রোত এই সব অনুভূতি ঘুণধরা জীবনের ভেতর নতুন জীবনের বীজ বুনে দ্যায় কিন্নতু সেসব জীবনের কথা লিখতে ইচ্ছে করে না। আসলে আমি ঠিক সেরকম বিশ্বাসী নই/আমি আমার মত বিশ্বাস করি।’ এই বিশ্বাস থেকেই বারংবার তাঁর কবিতায় ফিরে ফিরে এসেছেন রবীন্দ্রনাথ, তবে তাঁর মতন—

আমি রবীন্দ্রনাথ হতে চাই না, হতে চাই না রঘু ডাকাত
আমি ফাল্গুনী রায় হতে চাই শুধুই ফাল্গুনী রায়
(ব্যক্তিগত বিছানা)

সূত্র

১. *আমার রাইফেল আমার বাইবেল অথবা ফাল্গুনী রায়ের ফাল্গুনী রায়*। মনচাষা।
২. *কালের পুতুল*। বুদ্ধদেব বসু
৩. *কবিতার রূপান্তর*। তপোধীর ভট্টাচার্য
৪. *হাংরি সাক্ষাৎকারমালা*। মলয় রায়চৌধুরী
৫. *ক্ষুধার্ত*, ২য় ও ৩য় সংকলন এবং *হাওয়া ৪৯*, *হাংরি বুলেটিন*, *ক্রমশ* এবং *কবিসম্মেলন* প্রভৃতি পত্রপত্রিকা